ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

ইউসুফ-*জোলেখা*'য় শাহ মুহম্মদ সগীরের কবিত্ব: নবনিরীক্ষা ও শিল্পদৃষ্টি

*আহম্মদ শরীফ

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। এ ধারার রূপকার মুসলিম কবিগণ। হিন্দি-অবধী ভাষায় রচিত ভারতীয় কাহিনি এবং আরবি-ফারসি ভাষায় রচিত আরবীয়-ইরানীয় কাহিনি থেকে উপকরণ নিয়ে এ প্রণয়কাব্যগুলো লেখা হয়েছে। মধ্যেযুগে রচিত এশ্রেণির কাব্যেই প্রথম কোন দেবদেবীর কাহিনি নয়, রক্ত মাংসের মানব-মানবীর প্রেম কাহিনি স্থান পেয়েছে। এসমস্ত কাব্যে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। মুসলিম কবিরা সনাতন ধর্মাচারের বাইরে এসে মানবীয় অনুভূতিসম্পন্ন কাব্য রচনায় অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এধারার প্রথম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সময়ে ইউসুফ-*জোলেখা* কাব্য রচনা করেন। কাব্যের মূল বিষয়বস্তু ইউসুফ জোলেখার প্রেম। জোলেখার হৃদয়গত ও দেহগত প্রেমের সঙ্গে সুফিতত্ত্বের আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে মানবিক প্রেমের অপূর্ব ত্যাগ, তিতিক্ষা ও মহিমার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে আলোচ্য কাব্যে। তাঁর পাণ্ডিত্য, ভাবের গভীরতা, ভক্তি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা আমাদের অভিভূত করে। কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্যে ভাষা নির্বাচন, ছন্দপ্রয়োগ কিংবা অলঙ্কারের সার্থক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। বর্তমান প্রবন্ধটি ইউসুফ-*জোলেখা* কাব্যের বিভিন্ন বিষয় এবং কবির বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যের গভীরতা তুলে ধরবার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

Romance ইংরেজি শব্দ। শব্দটি লাতিন ভাষা থেকে আগত। 'লাতিন ভাষায় রোমক সাম্রাজ্যকে বলা হত "Imperium Romanum"। এই Romanum শব্দটি থেকেই নিম্নলিখিতভাবে 'রোমান্স' কথাটির জন্ম, Romanum>Romanice>Romance।'[১] আবার Oxford Advanced Learner's Dictionary'তে 'romance'-শব্দটির অর্থ:

> romance: 1[C] an exciting, usually short, relationship between two people who are in love with each other; 2[U] love or the felling of being in love; 3[U] a feeling of excitement and adventure, especially connected to a particular place or activity; 4[C] a story about a love affair; 5[C] a story of excitement and adventure, often set in the past;[২]

Romance এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অর্থ ব্যাপক। রোমান্স লঘু কল্পনার বিষয়। এর বাহন কল্পনাশক্তি; আর সে কল্পনাশক্তিকে হতে হয় সৃজনধর্মী। 'সাধারণতঃ মুক্তবিলাস, অবাধগতি, অকারণ পুলক ও অবারণ আনন্দ রোমান্সের লক্ষ্য।'[৩] বস্তুজগতের বাইরের জগত, দেখার বাইরের যে অদেখার জগত সেখানেই অলৌকিক রহস্যের অবস্থান। আর এ রহস্যভেদের একমাত্র উপায় কল্পনাশক্তি। প্রত্যক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে কোনো এক অতীন্দ্রিয়ের জগতকে, অধরার জগতকে কল্পনার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখাই রোমান্টিকতা। আর তাই 'জীবনের বাস্তব রূপের উপর কল্পনার আরোপ চিত্রিত করে রহস্যময় কোনো চেতনার অনুসন্ধানের মাধ্যমে কল্পনার আলোয় জীবনকে বাস্তবাতীত করে দেখার ব্যাপারটাই রোমান্টিসিজম বা রোমান্টিকতা।'[৪]

---

* পিএইচডি গবেষক (ইউজিসি ফেলো), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী অধ্যাপক ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

রোমান্টিকচেতনার জন্ম ইউরোপে। উনিশ শতকে ইউরোপজুড়ে পুঁজিবাদের উত্থান ও সামন্তবাদের পতনের সন্ধিক্ষণেই রোমান্টিক ধ্যানধারণার বিকাশ হতে থাকে। রোমান্স সাহিত্যের সৃষ্টি সম্পর্কে আবদুল হাফিজ বলেন:

> রোমীয় সাম্রাজ্য বহুবিস্তৃত হয়ে পড়লে লাতিন ভাষাও সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অন্যদিকে স্থানীয় ভাষাসমূহের প্রভাবে লাতিন ভাষাও তার 'ধ্রুপদী' রূপ হারিয়ে জনগণের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছয় অর্থাৎ 'পপুলার' হয়ে উঠে। এই 'পপুলার লাতিন' জন্ম দেয় ইউরোপের সাত সাতটি আধুনিক ভাষার। মধ্যযুগীয় ভাষার বিশেষজ্ঞরা এসব নতুন ভাষাগুলোকেই 'রোমান্স ভাষা' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। আর এসব নতুন রোমান্স ভাষায় কাহিনী অবলম্বন করে গদ্যে-পদ্যে যে-সাহিত্য রচিত হতে থাকে তাকেই বলা হল রোমান্স সাহিত্য।[৫]

খ্রিষ্টধর্মের উষালগ্নে ইউরোপে রোমান্স লেখার সূত্রপাত। তখনো এসমস্ত লেখায় একেশ্বরবাদী ধর্মীয় চেতনার স্বরূপটি ফুটে উঠে নি। পৌত্তলিকতাবাদে বিশ্বাসী ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিক গ্রিক ও রোমীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁদের হাতে অতিপ্রাকৃত দেবনির্ভর সাহিত্য রচিত হতে থাকে। একেশ্বরবাদী ধর্মের আলোকে রচিত সাহিত্যে নতুন চেতনা প্রযুক্ত হলেও প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্য এধারায় অক্ষুণ্ন থাকে। আর তাই এসব কাহিনিতে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, অস্বাভাবিক এবং দৈবনির্ভরতার মতো উপাদান লক্ষণীয়। বাংলা রোমান্সের সৃষ্টি সম্পর্কে ড. অমৃতলাল বালা বলেন:

> ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্য রামায়ণ-মহাভারত দৈব মহিমা হারিয়ে মানবমুখী গল্পরস যুগিয়েছে। তারপর মধ্যযুগে একেশ্বরবাদী ইসলামের সংস্পর্শে এসে এবং আরব-ইরানের কেচ্ছা কাহিনীর অফুরন্ত ভাণ্ডারের প্রভাবে রোমান্সের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। ইউরোপে যেমন করে খ্রিষ্টান সাধু-সন্তদের জীবন ও অলৌকিক-অদ্ভুত-অতিপ্রাকৃত কার্যাবলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিশাল কাহিনীর সমাবেশ, তেমনি প্রাচ্যে মুসলিম পীর দরবেশ, সুফিদের জীবনীগ্রন্থ 'তাজকেরাতুল আওলিয়া', বড়পীর সাহেবের জীবনী অবলম্বনে সেদিন ঘটে অলৌকিক-অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও কাহিনীর সমাবেশ। অনেক কবি এসব উপাদান সংগ্রহ করে রোমান্সসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যৌথ উপকরণ-উপাদান বাংলা রোমান্স সৃষ্টিতে প্রেরণার উৎস হতে পেরেছে। বিশেষ করে রোমান্স সাহিত্যের উপাখ্যানমালাকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কাহিনীই সেদিন বিষয়বস্তু যুগিয়েছিল বলে ইউরোপীয় রোমান্সের সঙ্গে বাংলা রোমান্সের মিল দেখা যায়। এ মিল কেবল মাত্র কাহিনীতেই নয়, বরং তা ঘটনাসংস্থান, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষীভূত।[৬]

রোমান্সকাব্যের কবিগণ প্রায়ই ছিলেন সামন্তশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত বা আশীর্বাদপুষ্ট। সামন্ত রাজদরবারে আশ্রিত এসমস্ত কবি তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের মন জয় করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। রাজাবাদশা বা সামন্তশ্রেণির এসমস্ত জায়গীরদার-জমিদারদের জীবনের যুদ্ধবিগ্রহ এবং তাঁদের অসীম ক্ষমতা ও যুদ্ধের সীমাহীন উদ্যোগ-আয়োজন, পরকীয়া, অলৌকিকতা বা অস্বাভাবিকতা ও নায়কের দুঃসাহসিক অভিযাত্রা শেষে প্রেয়সীকে লাভে সফলতা ও সুখভোগের বর্ণনায় কবিরা ছিলেন পঞ্চমুখ। সেদিনের সভাকবিদের কাছে এ ধরনের লেখার বিষয়বস্তুই ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার। ভোগবিলাসী জীবনে অভ্যস্ত সামন্তবাদী প্রভুদের কাছে ঐ সমস্ত দুঃসাহসিক, শিহরণমূলক কাহিনি ছিলো পরম উপাদেয় ও চরম প্রাপ্তির বিষয়। দরবারে আশ্রিত কবিরাও প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য এসব অতিরঞ্জিত, কল্পনাসর্বস্ব কাহিনির জন্ম দিতেন।

বাংলা রোমান্সসাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে এদেশে মুসলিম আগমনের ইতিহাস সম্পর্কযুক্ত। '১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়ার বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন।'[৭] শুরু হয় বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত। অবশ্য এর বহু পূর্ব হতেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মুসলিম বণিক ও সুফি-পির-দরবেশ এবং আলেম-উলামাদের আগমন ঘটে। 'অনন্ত আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। অবশ্য 'Periplus in the Erythrean Sea'-এর আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্ক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেয়া সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বেনেরা বছরে কয়েক মাস থেকে যেত।'[৮] বাংলায় মুসলিম শাসন শুরুর পরে নবাগত ইসলামের সঙ্গে পৌত্তলিক বা হিন্দু ধর্মের সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথমদিকে সংঘর্ষ সংঘঠিত হলেও পরে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতেও সময় লাগে নি। আর এভাবেই:

> ক্রমে বঙ্গে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভাষায়, ভাবে এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চায় মুসলিম ঐতিহ্য অবাধে প্রবেশ শুরু করে। অবশ্য পরধর্মসহিষ্ণু মুসলিম শাসকগণ হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাটিকেও সঞ্জীবিত রাখতে এদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যসেবীদের সমান উৎসাহিত করেন। মুসলিম শাসকগণের দ্বারা সৃষ্ট এই জাতিগত, ভাবগত ও সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য সৃষ্টির ফলে বঙ্গে মুসলিম-ঐত্যিবাহী সাহিত্য শুধু সমৃদ্ধই হয় নি, এদেশে মুসলিম শাসন ব্যবস্থাও দৃঢ় হয়।[৯]

বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৭) বদান্যতায় গৌড়ের শাহী দরবার সাহিত্য সৃষ্টি ও চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মহানুভবতায় যে ধারার সৃষ্টি হয় তা অব্যাহত থাকে ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। গৌড়ের শাহী দরবারে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলে এসময়ে হিন্দু-মুসলিম উভয়ধারার কবি বিচিত্র বিষয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন যেখানে ছায়াপাত ঘটে তৎকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনচেতনার। স্বাধীন সুলতানী আমলের এই সৃষ্টিধারা পরবর্তী মোগল যুগে আরও প্রসারিত হয়। বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের নিগৃহীত নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী ইসলামের সুশীতল পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তুর্কিরা এদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁরা এদেশীয় আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। সেদিন ইসলামের সঙ্গে এদেশে বসবাসরতদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বাংলার সংস্কৃতিতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রকে উর্বর করেছিলো। পরবর্তী মোগল আমলকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে 'স্বর্ণযুগ' নামে অভিহিত করা যায়। কারণ এ যুগে সাহিত্যের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হওয়ার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার নবদিগন্তের সূচনা হয়।

রোমান্টিক প্রণয়োখ্যানধারার সাহিত্য চর্চিত হয়েছে পনেরো শতক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। মূলত মুসলিম কবিরাই এধারার সাহিত্য সৃজনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'চর্যাকার থেকে কবিওয়ালা অবধি হিন্দুর হাতে দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক ধর্মীয় প্রচার সাহিত্যই পেয়েছি। ধর্মভাব জাগানো এর লক্ষ্য–সাহিত্যশিল্প এর আনুষঙ্গিক রূপ এবং সাহিত্য–রস এর আকস্মিক ফল। অপর দিকে মুসলমানদের হাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট ও পুষ্ট হতে থাকে।'[১০] মধ্যযুগের ধর্মীয় সাহিত্যধারার বাইরে এসে রোমান্স কবিগণ মানব-মানবীর প্রেমের জয়গান গেয়েছেন রোমান্টিক প্রণয়কাব্যে। 'ফার্সি ও হিন্দী-আওধী সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়কাহিনির ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ

করে মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যের রুচিবদল করেছিলেন।'[১১] বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের পূর্ব অর্থাৎ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য পর্যন্ত সাহিত্যে ধর্মীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মীয় প্রভাব এতটাই বেশি ছিলো যে চাঁদ সদাগরের মতো প্রবল ব্যক্তিত্ববান চরিত্রও দেবতার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। অপরদিকে ইসলাম ধর্মে কোনো দেব-দেবীর স্থান নেই। একেশ্বরবাদীতাই ইসলাম ধর্মের মূলভিত্তি। মুসলিমরা একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরকে জানেন, মানেন, বিশ্বাস ও তাঁর উপাসনা করেন। তাই এখানে অবতারবাদের প্রসঙ্গ বাতুলতামাত্র। এজন্য *ইউসুফ-জোলেখা*, *লায়লী-মজনু*, *হানিফা-কয়রাপরী*, *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*, *সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী*, *পদ্মাবতী*, *চন্দ্রাবতী*, *মধুমালতী*, *গুলে বকাওলী* বা *মৃগাবতী* প্রভৃতি প্রণয়কাব্য ধর্মপ্রধান নয়, রস প্রধান। এগুলোতে প্রতিফলিত যে ধর্ম তা হলো জীবনধর্ম। কোনো দৈব শক্তি নয়, বরং মানবীয় গুণসম্পন্ন চরিত্রের সমাবেশই এশ্রেণির কাব্যাঙ্গনকে করেছে মুখরিত। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য:

> মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাহিনী সৃষ্টির প্রেরণা আসে দুই দিক থেকে। একদিকে উত্তর ভারতীয় রোমান্টিক কাহিনীগুলো মুসলিম কবিদের প্রেরণা যোগায়। অন্যদিকে আরবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির ফলে মুসলিম কবিরা উৎসাহের সঙ্গে ইরানি গালগল্পকে বাংলা সাহিত্যে আমদানী করেন। এসব কাহিনীতে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেও আনন্দের পরিচর্যা বেশি থাকে বলে সাধারণের মনে তার একটি স্থায়ী আসন গড়ে ওঠে। মধ্যযুগের কবিরা হয়তো তাঁদের বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন যে বাস্তব জীবনের অনেক অভাব পূরণ করে সাহিত্য; এবং সেই সাহিত্যের ধারাটি যদি রোমান্সরসে বেগবান হয় তবে সেই রস পান করে সাধারণ মানুষ বাস্তবতার রূঢ়তাকে ভুলতে পারে। তাই মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের সাহিত্যধারায় আমরা একদিকে যেন রোমান্স সৃষ্টির সার্থকতা লক্ষ্য করি অন্যদিকে প্রণয়জীবনের আকুতি ও মিলন-বিরহের মধ্যে মানবীয় জীবন-মহিমার স্বভাবসুন্দর স্পন্দন অনুভব করি।[১২]

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মূল উপজীব্য প্রেম। দৃশ্যত এ প্রেম মানব-মানবীর প্রেম। পার্থিব জীবনে কামনা-বাসনার বিষবাষ্প এবং রিরংসা বৃত্তির মধ্য দিয়েও প্রেম যে অপার্থিব আধ্যাত্মলোকে তথা স্বর্গীয় স্তরে উন্নীত হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রণয়কাব্য। মানব-মানবীর কামগন্ধ মিশ্রিত দেহজাত প্রেমের আড়ালে এ প্রেম অত্যন্ত পুত-পবিত্র। যে প্রেম ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম-সাধনা, কৃচ্ছ্রতা ও পবিত্রতার আদর্শে উজ্জীবিত। যে প্রেম সমস্ত লোভ-লালসা, প্রলোভন, ক্ষমতা ও নগ্নতাকে জয় করতে পারে। উত্তীর্ণ হয় সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষায়। দুঃখের অনলে পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হওয়া সেই মহান প্রেমেরই জয়গান ঘোষিত হয়েছে প্রণয়কাব্যে। এ সম্পর্কিত ড. আহমদ শরীফ-এর মত প্রণিধানযোগ্য:

> প্রেমের পথ চিরকালই দুর্গম ও দুস্তর। দেহ-মন-আত্মার অভিন্ন ঐকিক ঐকান্তিক প্রয়াসেই কেবল এ সাধনায় সিদ্ধি সম্ভব। তাই লোক-লস্কর, ধন-সম্পদ সম্বল করে যাত্রা করলেও শেষ পর্যন্ত রাজকুমার হয় নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল। দেহ-প্রাণ-আত্মার এই কৃচ্ছ্রসাধনায় সঙ্গ-সাক্ষ্য সহায়ক নয়-বাধা। বাহুবল, মনোবল, প্রণয়বাঞ্ছা ও রাগনিষ্ঠা পাথেয় করে প্রেমিককে অতিক্রম করতে হবে মৃত্যুসঙ্কুল 'গিরি-মরু-কান্তার ও দুস্তর পারাবার।' এরই ফলে রূপ রসে, কাম প্রেমে ও মোহ আত্মিক আকর্ষণে হয় উন্নীত। এভাবেই ঘটে প্রেমতীর্থে উত্তরণ। সোনা যতই জ্বলে ততই বাড়ে তার ঔজ্জ্বল্য তেমনি বাধাবিপত্তি যতই হয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রেমের উপলব্ধি ততই পায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা। খাঁটি সোনার মত দুঃখের দাহনেই মেলে খাঁটি প্রেম।[১৩]

এই সুকঠিন প্রেমের সাধনাই করেছেন প্রণয়কাব্যের নায়ক-নায়িকাগণ। প্রেমের দুর্গমপথে দুঃসাহসিক যাত্রায় মুগ্ধ হয়েছেন পাঠক ও ভক্তবৃন্দ; কখনোবা তাঁদের হৃদয় হয়েছে আকোপ্লুত। তবে প্রণয়কাব্যে প্রতিফলিত এ প্রেম রূপক অর্থেই কবিরা ব্যবহার করেছেন। এসমস্ত কাব্যে মানব-মানবীর প্রেমের রূপকে সুফিতত্ত্বের কথা উঠে এসেছে বারবার। সুফিমতে সমগ্র সৃষ্টিজগত হলো স্রষ্টার আনন্দ সহচর। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক আনন্দের তথা প্রণয়ের। তাই এ সম্পর্কে কোনো নিয়ম-নীতির প্রয়োজন নেই, ফলে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা সেখানে গৌণ। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ পরস্পরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠাই হলো প্রেমের ধর্ম। বৈষ্ণবধর্মে এ প্রেমকে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জীবাত্মা হলো রাধা এবং পরমাত্মা কৃষ্ণ। এ প্রেমের ক্ষেত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। জীবাত্মা কঠোর সাধনায় আত্মনাশ করে বিরহে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। সুফিরা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এ প্রেমকেই ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ বলে অভিহিত করে থাকেন। মরমী সুফিসাধকগণ আল্লাহর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের প্রেম দেখিয়ে আশেক-মাশুকতত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। সুফি কবিগণ আধ্যাত্মিক মার্গের এ তত্ত্বের ভিত্তিতে রোমান্সকাব্য রচনা করেন। তাঁরা রাজা-বাদশা-আমির-ওমরা ও শাসকশ্রেণির প্রচলিত প্রেমকাহিনিকে আধ্যাত্মিক প্রেমকাহিনিতে রূপান্তরিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ওয়াকিল আহমদ বলেন:

> সুফী কবিগণ রাজা-বাদশাহ-আমীর-বণিক প্রভৃতি শাসক ও বণিক শ্রেণীর প্রচলিত প্রেমকাহিনীকে আধ্যাত্মিক প্রেম কাহিনীতে রূপান্তরিত করেন। সুফীদের ঐশী প্রেমচেতনার কারণে সামন্ত প্রেমের শারীরিকতার স্থলে নর-নারীর শাশ্বত প্রেম এল, প্রেমের পাত্রী নারীর মর্যাদা স্বীকৃতি পেল; ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংগ্রাম-সাধনা ছাড়া প্রেমিকাকে পাওয়া যায় না–প্রেমের এই আদর্শ রোমান্সের ঘটনার ও কাহিনীর নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। সুফীর আধ্যাত্মিকতা রোমান্সের প্রেমের মধ্যে রাগ-অনুরাগ, লোভ-ঈর্ষা, ভোগবাসনা, মিলন-বিরহ ইত্যাদির মিশ্রণে এক অভিনব রস ও স্বাদ দান করে। সামন্ত সমাজব্যবস্থায় ধার্মিকতার ও নৈতিকতার সাথে আপোষ করতে কবিদের এ-পথ বেছে নিতে হয়।[১৪]

মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত চরিত্র অনেকটাই দৈব প্রভাবিত। প্রধান চরিত্রগুলোর প্রায় সবাই স্বর্গের শাপভ্রষ্ট দেবশিশু। দেবতার শাপে অভিশপ্ত হয়ে তাঁরা শাস্তি ভোগের জন্য মর্ত্যে আসেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করার পরে আবার স্বর্গপানে যাত্রা করেন। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এবং *বৈষ্ণবপদাবলি*-এর রাধা-কৃষ্ণ, রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্র, জীবনীসাহিত্যের শ্রীচৈতন্যদেব, *মনসামঙ্গল* কাব্যের চাঁদ সদাগর, বেহুলা-লখিন্দর, *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের কালকেতু-ফুল্লরা কিংবা *অন্নদামঙ্গল*-কাব্যের হরিহোড়, ভবানন্দ মজুমদার এঁরা সবাই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু বা অতিমানবীয় চরিত্র। মধ্যযুগের সাহিত্যধারায় একমাত্র রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানেই আমরা স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু নয়, বরং মর্ত্যের রক্তে-মাংসে গড়া মানব-মানবীর সাক্ষাৎ পাই। চরিত্র চিত্রণের এ ভিন্নতা মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য থেকে প্রণয়কাব্যগুলোকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। সামন্ত দরবারাশ্রিত কবিগণ কখনো কখনো সাধারণ পর্যায়ের জীবনচিত্রও তুলে ধরেছেন তাঁদের কাব্যে। কখনোবা ঐতিহাসিক চরিত্রকে কাব্যের প্রধান চরিত্র হিসেবে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

দুই

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন *চর্যাপদ*। *চর্যাপদ*-এর পরেই মধ্যযুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য। *চার্যাপদ* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর মাঝে উল্লেখযোগ্য তেমনকোনো

সাহিত্যিক নিদর্শন নেই এক *শেখ শুভোদয়া* ছাড়া। এর পরবর্তীতে আমরা পাই ইউসুফ-*জোলেখা* (১৩৮৯-১৪১০) কাব্য। 'শাহ মোহাম্মদ সগীর সামাজিক দায়িত্ব এবং ধর্মীয় ও নৈতিক প্রেরণা থেকে ইউসুফ-*জোলেখা* রচনা করেন।'[১৫] ইউসুফ-*জোলেখা* কাব্যের প্রাচীনত্ব এবং বাংলা সাহিত্যে তার গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ বলেন:

> ...সেদিক দিয়ে দেখলে চর্যগীতি যেমন দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে অর্বাচীনতম অবহট্‌ঠ ভাষার আদি নমুনা, তেমনি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীঃ) ইউসুফ জোলায়খাই আদি প্রণয়োপাখ্যান। কেন না, কবি দাউদের 'চান্দাইন' অধ্যাত্ম তত্ত্বরসাশ্রিত মসনবী কাব্য আর দামো ও সাধনের কাব্যের রচনাকাল অনিশ্চিত। নতুন কোন তথ্যপ্রমাণ না মেলা অবধি আমাদের এ মতই পোষণ করতে হবে। চর্যাগীত যেমন ভারতিক ভাষাজগতে সন্ধিযুগের স্মারকস্তম্ভ, তেমনি 'ইউসুফ জোলায়খা'ও রোমান্টিক সাহিত্যের গৌরব মিনার।[১৬]

ইউসুফ-*জোলেখা* বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য। এ কাব্যের কাহিনিটি অতি প্রাচীন। বাইবেল ও পবিত্র কুরআনে এ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'ভাবগত আবেদনের দিক দিয়ে বাইবেলের কাহিনি অধিক মানবিক। পিতৃস্নেহ, ভ্রাতৃদ্রোহ, দেহজ কামনা, মিলনানন্দ, মৃত্যুশোক প্রভৃতি লৌকিক ভাব বাইবেলের গল্পে প্রাধ্যান্য লাভ করেছে।'[১৭] পবিত্র কুরআনে একে 'আহসানুল কাসাস' (অনুপম কাহিনি) বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সুরা ইউসুফ (১২ সংখ্যক সুরা) নামে একটি পৃথক সুরাও রয়েছে। সুরা ইউসুফের মূল কাহিনি শুরু হয়েছে চার নম্বর আয়াত থেকে এবং একশত নম্বর আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ রয়েছে। শেষের এগারোটি আয়াতে উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। 'কুরআন-কাহিনির কাঠামোয় ধীরে ধীরে রক্তমাংস জুড়ে এই উপাখ্যান পরিণত ও পৃথক হয়ে ওঠে। সব চরিত্রেরই নামকরণ হয়, নানা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা যুক্ত হয় এবং মূল প্রণয়কাহিনি মিলনান্ত পরিণতি লাভ করে।'[১৮] বাইবেল ও কুরআনের কাহিনি সংক্ষিপ্ত। "এই সংক্ষিপ্ত মূল-কাহিনিকে পল্লবিত করিয়া ইরানের মহাকবি ফিরদৌসী (মৃত ১০২৫ খ্রী:) ও সুফী কবি জামী (মৃত ১৪৯২ খ্রী:) তাঁহাদের ইউসুফ *জলিখা* নামক কাব্য দুইখানি রচনা করিয়াছিলেন। ফিরদৌসীর ইউসুফ-*জলিখা* একটি রমন্যাস বা রোমাঞ্চ এবং জামীর ইউসুফ *জলিখা* একটি 'এলিগরিক্যাল এপিক' বা রূপক কাব্য। বিষয়বস্তু বা অনুবাদগত দিক হইতে সগীরের কাব্যের সহিত উক্ত কাব্যদ্বয়ের কোনটিরই হুবহু মিল নাই।"[১৯] শাহ মুহম্মদ সগীর ফেরদৌসীর কাব্য ও কুরআন ছাড়া হয়তো মুসলিম-কিংবদন্তি দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েথাকবেন। 'বাংলার মাটিতে আরব-ইরানের বিষয় নিয়ে এই প্রথম কাব্য রচিত হল।'[২০] কবি যে ইউসুফ-*জোলেখা* কাব্য রচনা করতে গিয়ে স্পষ্টতই জামীর ইউসুফ-*জোলায়খা* কাব্যের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করেন নি সে সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ-এর মন্তব্য:

> এ কাব্য যে জামীর 'ইউসুফ জোলায়খা' কাব্যের অনুবাদ নয়– কিংবা ছায়া অবলম্বনে অথবা অনুকরণে রচিত নয়, তা কাহিনীর শেষাংশে ভারতীয় রাজকন্যার সঙ্গে ইবনে আমিনের বিবাহ বর্ণনায় নয় কেবল, গোটা কাব্যেই নানা প্রসঙ্গে দেশী পরিবেশ বর্ণনা ও মৌলিক উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্যেই সুপ্রকট। কবি কিতাব-কোরআন দেখে কাব্য রচনা করেছেন বলে যখন স্বীকারই করেছেন, তখন জামীর কাব্যই আদর্শ হলে জামীর নাম নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন।[২১]

মধ্যযুগের কবিরা অনেকেই তাঁদের কাব্যে নিজের পরিচয়জ্ঞাপক তথ্য সংযোজন করতেন। সে যুগে ইতিহাস লেখার প্রচলন ছিলো না বা ইতিহাস লিখে রাখতে হবে এধারণাও তৈরি হয়নি। কাজেই

কবি সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য কাব্যে বর্ণিত পরিচয়জ্ঞাপক অংশটুকু। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাব্যে উল্লিখিত কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বা ঘটনা প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করেও অনেক সময় কবি ও কাব্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগের অনেক কবিই তাঁদের কাব্যে নিজের পরিচয়সূচক তথ্য প্রদান করেছেন। জন্মস্থান, বংশপরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা, পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তির নাম কবিতায় স্থান পেতো। বিশেষ করে মধ্যযুগের কবি আলাওল কিংবা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া বেশকিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাঁদের কাব্যে। এ বর্ণনা কখনোবা হয়েছে রূপকাত্মক। কিন্তু কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যের 'রাজ-প্রশস্তি' অংশে শুধু তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সম্পর্কিত তথ্য রূপকের মাধ্যমে প্রদান ব্যতীত অন্যকোনো তথ্য আমাদের জানান নি। 'সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে বাঙলার সাথে বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়।'[২২] পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় হতো। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং কবি ও বিদ্বানদের তিনি সমাদর করতেন। সুলতান যে কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেটাও মাত্র একটি চরণ থেকে বুঝে নিতে হয় 'মোহাম্মদ ছগির তান আজ্ঞাক অধীন'[২৩] এই মাত্র। কিন্তু কখন, কোথায়, কীভাবে সুলতান তাঁকে কাব্য রচনায় আশ্রয়-প্রশ্রয় বা অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন তা আমাদের অজানা। কবিও এ সম্পর্কে নীরব। 'শাহ মুহম্মদ সগীর যে রাজকর্মচারী ছিলেন তা কেবল 'তান আজ্ঞাক অধীন' উক্তির সাক্ষ্যে নয়, 'রাজদর্শনের আদব-কায়দা' নির্দেশের প্রমাণেও বিশ্বাস করতে হবে। তবে একেবারে সোনারগাঁয়ে সুলতান-দরবারেই কর্মচারী ছিলেন কি-না বলা যাবে না।'[২৪] আবার কবির আশ্রয়দাতা যে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ'ই সেটাও মাত্র একটি চরণে কবি উল্লেখ করেছেন 'পুত্র শিষ্য হন্তে তিহঁ মাগে পরাজয়'[২৫]। কবির বর্ণিত 'মহা নরপতি গ্যেছ' বাদশা হলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। কারণ সেই বাদশা জোরপূর্বক বাহুবলে পিতার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন:

> কবি যেন বলিতে চাহিতেছেন, তাঁহার প্রশংসিত বাদশাহের কাছ হইতে বাদশাহের পিতা পরাজয় কামনা করিয়াছিলেন,–পুত্রের হাতে পরাজিত হইয়া পিতা যেন গৌরব বোধ করিয়াছিলেন। সমগ্র বাংলার ইতিহাসে একমাত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সহিত তাঁহার পিতা সিকন্দর শাহের যুদ্ধের কথা জানিতে পারা যায়। সুতরাং, কবির উদ্দিষ্ট বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ (১৩৮৯-১৪১০) ব্যতীত কেহ নহেন।[২৬]

কাজেই কবি সম্পর্কিত নানা তথ্য গবেষককে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করতে হয়। কবির জন্মস্থান কোথায় ছিলো এ সম্পর্কিত তথ্য আমাদের অজানা। কাব্যে তাঁর জন্মভূমি সম্পর্কিত প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ নেই। তবে শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যের যে কয়টি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে তিনটিই চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং একটি ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যের চট্টগ্রাম অঞ্চলের কিছু কিছু ভাষার ব্যবহার দেখে মনে করেন কবির জন্মস্থান চট্টগ্রাম অঞ্চল। তিনি চট্টগ্রামের লোক না হলেও অন্তত তিনি যে পূর্ববঙ্গের লোক সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।[২৭] কবির 'শাহ' উপাধি দেখে অনেকে মনে করেন কবি সুফিসাধক ছিলেন অথবা তিনি কোনো পিরের মুরিদ ছিলেন। এ সম্পর্কিত সমালোচকের মত:

> ভণিতায় 'শাহ মোহাম্মদ' ও 'মোহাম্মদ' নামও বিরল নয়। এতে মনে হবে–কবির নাম মোহাম্মদ। পীর পরিবারে জন্ম বলে 'শাহ' কুলবাচিও যুক্ত হয়েছে নামের সঙ্গে।

> আর হয়তো কবির কোন পূর্বপুরুষের নাম 'সগীর' ছিল বলে অথবা 'সগীর' নামের পীরের মুরিদ বা শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই তিনি 'সগিরী'।[২৮]

ইউসুফ-জোলেখা কাব্য রচনায় কবির ধর্মীয় অনুপ্রেরণা কাজ করেছে বলে কবি উল্লেখ করেছেন। 'কবি সগীর শুধু কাব্য-রস পরিবেশনের খাতিরে এই কাব্য রচনা করেন নাই; এই কাব্য রচনার পশ্চাতে ধর্ম প্রেরণা সুস্পষ্ট।'[২৯] তবে বাংলা ভাষায় ধর্মকথা প্রকাশ করতে গিয়ে কবির মনে যে 'পাপ ভয়' কাজ করে নি এমনটি নয়। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভয় ও 'লাজ'কে ঝেড়ে ফেলে কবি 'প্রেম রসে ধর্ম বাণী' প্রচার করতে আলোচ্য কাব্যটি রচনা করেছেন। এ কাহিনিটির উৎস যে কিতাব কবি সেটাও আমাদের জানিয়েছেন। এ সম্পর্কিত কবির উক্তি:

বচন রতন মণি জতনে পুরিআ।
প্রেম রসে ধর্ম বাণী কহিমু ভরিআ॥
ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা।
ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা॥[৩০]

কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের একমাত্র কাব্য *ইউসুফ-জোলেখা*। আর কোনো কাব্য তিনি লিখেছিলেন কিনা তা জানার উপায় নেই। তবে কাব্যে ভাষার ব্যবহার দেখে কোনো কোনো সমালোচক মনে করে এটি তাঁর একমাত্র কাব্য নয়, হয়তো কবি অন্য কোনো কাব্য লিখে থাকবেন কিন্তু কালের গর্ভে তা হারিয়ে গেছে বা তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এর কাহিনিটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মূল কাহিনির সঙ্গে মধুপুরী রাজ্যের গন্ধর্বরাজ শাহাবাল কন্যা বিধুপ্রভার সঙ্গে ইবনে আমিনের স্বপ্নে পরিচয়, প্রণয় ও বিবাহ এবং শাহাবাল রাজ কর্তৃক ইবনে আমিনকে রাজ্যদানের বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে। এতে কাহিনিটি হয়েছে দীর্ঘ। এই উপকাহিনিটি মূল কাহিনির সঙ্গে যুক্ত করবার উদ্দেশ্য ছিলো গল্প তৈরি করা। এটি সগীরের কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে:

> অবলীলাক্রমে গল্প লিখতে পেরেছেন-এটাই সগীরের কৃতিত্ব। গল্পের ঘনঘটায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা রোমান্টিক কবিদের লক্ষ্য ছিল। দর্শনচিন্তা, তত্ত্বচিন্তা অথবা চরিত্র-চিত্রণের প্রতি তাঁরা বেশী নজর দেননি। সরস গল্প সৃষ্টি করে নিছক আনন্দের ভোজে পাঠকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সগীরের কলম সে পথ বেছে নিয়েছে। গল্পরচনা কবির লক্ষ্য বলে ঘটনার গ্রহণ-বর্জনের কোন হিসাব করেননি।[৩১]

কাহিনি পরিক্রমায় জানা যায় পশ্চিম দিকের তৈমুছ নামের একজন রাজা ছিলেন। ধন-জন, সৈন্য-সামন্ত কোনো কিছুর তাঁর অভাব নেই। এককথায় 'তাহান তুলনা রাজা নাহি পৃথিবীত'। সবকিছু থাকার পরে তাঁর কোনো সন্তান না থাকায় তিনি সুখী ছিলেন না। অবশেষে তপজপ ও 'দেবধর্ম' আরাধনা করার পরে তিনি এক কন্যাসন্তানের জনক হলেন। যথাসময়ে শিশুর নামকরণ করা হলো। নাম রাখা হলো 'জলিখা'। রাজকুমারী দিনে দিনে বেড়ে উঠতে থাকে:

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা জেহ্ন শশী-কলা।
মেঘ জনি উঠে জেহ্ন তড়িৎ উঝলা॥
সুনাম স্থাপন কৈলা জলিখা সুন্দরী।
ত্রিভুবন মধ্যে জেহ্ন রূপে অপছরী॥[৩২]

ধীরে ধীরে রাজকুমারী জোলেখা বড় হতে থাকে। ভরাবাদরের যৌবনবতী নদীর ন্যায় তাঁর দেহে সমস্ত যৌবনের রূপ প্রকাশিত হলো। কোনো এক রাত্রিতে রাজপ্রাসাদের সবাই যখন 'অচেতন সর্বজন জেন মৃত্যু গতি' এমন সময় জোলেখার স্বপ্নের মধ্যে 'অলক্ষিতে আইল পুরুষ অবতার'। পরপর তিনবার তিনি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে কুমার তাঁর পরিচয় জোলেখাকে জানিয়ে দিলেন; তাঁর নাম আজিজ মিছির এবং তিনি 'মিশ্রের' (মিশর) রাজ্যের অধিপতি এবং সেখানে গেলে জোলেখা তাঁর দেখা পাবেন। 'স্বপ্নের বৃত্তান্ত' জোলেখার পিতামাতা শুনে 'মনে পাইল ব্যথা'। অন্য কোনো উপায় না দেখে পিতা তৈমুছ কন্যার 'স্বয়ম্বর' সভার আয়োজন করলেন। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে আজিজ মিছিরের সঙ্গে তাঁর বিয়ের আয়োজন চললো। কিন্তু তিনি দেখলেন এই আজিজ মিছির তাঁর স্বপ্নে দেখা আজিজ মিছির নন। কাজেই জোলেখা 'নিশ্চয় করিলুঁ মনে খাই মরি বিষ' বলে সঙ্কল্প করলেন। এমন সময় জোলেখা দৈব বাণী শুনতে পেলেন:

আজিজ মিছির তোর নহে মনস্কাম।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম॥
আজিজ মিছির তোর পতি মাত্র লেখা।
তার যোগে হৈব তোর প্রভু সনে দেখা॥[৩৩]

অবশেষে দৈব বাণী শুনে জোলেখার আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হলো। আজিজ মিছিরকে বিয়ে করেও জোলেখা কুমারীর মতো নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে লাগলেন। তাঁর দুঃখের সীমা রইলো না। নানান ঋতুতে প্রকৃতি নানা রূপ ধারণ করে। কিন্তু জোলেখার জীবনে বৈচিত্র্য নেই। নেই কোনো আনন্দ। কারণ স্বপ্নে দেখা রাজপুরুষের সন্ধান তাঁর জানা নেই।

এদিকে 'কনআন'(কেনান) দেশে 'এয়াকুব' (ইয়াকুব) নামের এক নবী ছিলেন। তিনি 'জ্ঞানেত পণ্ডিত অতি শাস্ত্রে অবধান'। তাঁর দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর 'গর্ভে দশ পুত্র জন্মিল তাহান' এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর 'গর্ভে এক কন্যা দুই পুত্র' জন্ম গ্রহণ করলো। দ্বিতীয় স্ত্রীর এক পুত্রের নাম 'ইছুফ' এবং অন্য সন্তানের নাম বনী আমীন বা ইবনে আমীন। ইউসুফ বাল্যকাল থেকে ইয়াকুব নবীর খুব প্রিয় ছিলেন 'এয়াকুব নবীর ইছুফ জেহ্ন আঁখি'। এসব কারণে ইউসুফের বৈমাত্রেয় দশ ভাই ইউসুফকে হিংসা করতো। এমন অবস্থায় ইউসুফ একদিন স্বপ্ন দেখলেন:

একাদশ নক্ষত্র আওরে রবি-শশী।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভূমি তলে পশি॥[৩৪]

পিতা ইয়াকুব ইউসুফকে এই স্বপ্নের কথা গোপন রাখতে বললেন কিন্তু 'বিধির নিবন্ধ' অনুসারে ইউসুফ তাঁর স্বপ্নের কথা ভাইদের জানালেন। এ ঘটনার পরে ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফকে আরো হিংসা করতে লাগলো। ইউসুফকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মৃগয়ার ছলে তাঁকে বনে নিয়ে গিয়ে একটি নির্জন কূপে ফেলে দেওয়া হলো। ইউসুফ ঈশ্বরের কৃপায় কূপের মধ্যে 'রহি মনেত উল্লাস'। অন্যদিকে ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা পিতাকে গিয়ে ইউসুফের ছেঁড়া ও রক্ত মাখানো জামা দেখিয়ে জানিয়ে দিলো 'ব্যাঘ্রে আসি ইছুফ ধরিল'। ইয়াকুব নবী কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা গেলেন।

ঘটনাক্রমে মণিরু নামের এক 'মহা ধনপতি' বণিজার মিশ্র (মিশর) দেশ হতে বাণিজ্য যাত্রার পথে ইউসুফকে কূপ থেকে রক্ষা করে নিজ দেশ মিশরে নিয়ে গেলেন 'চলিতে চলিতে গেলা মিশ্র সীমা মাঝ'। তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো ইউসুফের সৌন্দর্যের কথা। ইউসুফকে দেখতে এসে জোলেখা তাঁকে চিনতে পারলেন। বহু 'মণিমাণিক্য' দিয়ে জোলেখা ইউসুফকে

'পুত্র বাচ' (পুত্র তুল্য) কিনে নিলেন। ইউসুফকে প্রাসাদে এনে জোলেখা তাঁর যথাসম্ভব আদর-আপ্যায়ন করলেন। ইউসুফ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে নানাভাবে জোলেখা তাঁকে বশে আনতে চেষ্টা করেন। জোলেখার লক্ষ্য 'পিরীতি সন্ধানে তানে করিবাম বন্দী' কিন্তু ইউসুফ কিছুতেই বশে আসতে চায় না। নানাভাবে ইউসুফের প্রণয় যাচ্ঞা করে তিনি ব্যর্থ হলেন। চিন্তায় জোলেখার 'হইল কৃশ তনু' এবং তাঁর বিলাপই যেনো সম্বল হলো। অনেক সাধ্যসাধনার পরেও জোলেখার মনোবাঞ্ছা পূরণ না হলে ধাত্রীর পরমার্শে এক কামোদ্দীপক টঙ্গি নির্মাণ করানো হলো। সপ্তখণ্ড টঙ্গিতে নানা চিত্র অঙ্কিত হলো। সেই চিত্রের মধ্যে অনেকগুলো ছিলো কামোদ্দীপক:

জলিখাক কোলে বসাইল ধরি বলে।
বিবিধ বন্ধনে কেলি করে নানা ছলে॥
কোহ্ন চিত্রে অঞ্চলে ধরএ কাম রঙ্গে।
খেনে ধাএ খেনে চাহে খেনে বসে সঙ্গে॥[৩৫]

জোলেখা অপূর্বসাজে সজ্জিত হয়ে ইউসুফকে নিয়ে 'টঙ্গী দেখবার' গেলেন। উদ্দেশ্য ইউসুফের মধ্যে কামভাব জাগ্রত করা। চিত্র দেখে ইউসুফ কামাসক্ত হলে জোলেখার কার্যসিদ্ধি হবে। মন্দিরে প্রবেশ করে জোলেখা মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু ইউসুফ তখনো বোধবুদ্ধি হারান নি। তাই জোলেখার প্রণয় নিবেদন তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। 'তোহ্মার সঙ্গম মোর কাল' বলে ইউসুফ জোলেখাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং নীতিকথায় জোলেখার সম্বিৎ ফিরানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু জোলেখা নীতি ও ধর্মকথা বোঝেন না। তিনি জীবনকে উপভোগ করতে চান। নানা ছলাকলায় জোলেখা তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইউসুফ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সেখান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলেন। জোলেখা তাঁর পিছু নিয়ে 'পৃষ্ঠের বসন' আকড়ে ধরলে ইউসুফের পোশাকের পেছনের অংশ ছিঁড়ে জোলেখার হাতেই রয়ে গেলো। ইউসুফ দৌড়ে দরজায় আসতেই বাদশা আজিজের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো। জোলেখা তাঁর কুবুদ্ধি চরিতার্থ করতে না পেরে আজিজের কাছে ইউসুফের বিরুদ্ধে মন্দ অভিপ্রায়ের অভিযোগ তুলে নালিশ করলেন:

সেই স্থানে গেল চলি চোরের আকৃতি।
কাম অনুভাবে তার লুব্ধ হৈল মতি॥
পালঙ্গীত বসিয়া পরশে মোর অঙ্গ।
উঠিয়া বসিলুঁ মুই নিদ্রা করি ভঙ্গ॥[৩৬]

ইউসুফের কাছে আজিজ এ সম্পর্কিত সত্যমিথ্যা জানতে চাইলে লজ্জায় তিনি তা বলতে পারলেন না। তাছাড়া ইউসুফ দেখলেন এসমস্ত কথা প্রকাশ হলে 'ভুবন ভরিয়া হৈব তাহান খাঁখাঁর' অর্থাৎ জোলেখা কলঙ্কিনী হবে। তিনি আজিজকে জানিয়ে দিলেন 'বিধি মোর ভাল জানে দোষ গুণ ভার'। অন্যদিকে জোলেখা 'ধর্মনাম লই কিরা' করে ইউসুফের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলেন। কাজেই আজিজ সত্যমিথ্যা ভুলে গিয়ে ইউসুফকে এ কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে কয়েদ করার আদেশ দিলেন। ইউসুফ বাদশা আজিজকে জানিয়ে দিলেন এ ঘটনার একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী রয়েছে। ইউসুফের কথা অনুযায়ী জোলেখার সখীর দুগ্ধপোষ্য তিন মাসের শিশুকে দরবারে হাজির করা হলো। প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য আজিজ শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন। জোলেখার কোলে থেকেই শিশু উত্তর দিলো:

শিশু বোলে মুঞি নহোঁ নবীর চরিত।
কার তরে কার বাক্য ন কহি বিদিত॥
জাহার অগ্রত ভাগে বিদার বসন।
তার কথা মিথ্যা জান প্রলাপ বচন॥
জার পৃষ্ঠগত বস্ত্র বিদার প্রমাণ।
সেহি সত্যবাদী ধর্মশীল অনুমান॥[৩৭]

শিশুর সাক্ষ্য অনুযায়ী বাদশা আজিজ দেখলেন জোলেখার সামনের অংশে কাপড় ছেঁড়া এবং ইউসুফের পৃষ্ঠভাগের বসন ছেঁড়া। আজিজ জোলেখার প্রতি বিরক্ত হলেন। আজিজ তাঁকে নানাভাবে 'গঞ্জিলেক রাগে'। আজিজ এসমস্ত ঘটনা বাইরে প্রকাশ না করতে ইউসুফকে উপদেশ দিলেন। এসমস্ত ঘটনা গোপন থাকে না; বাতাসের আগে তা প্রচারিত হলো। নগরজুড়ে জোলেখার নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করলো। জোলেখার কানেও এমন কথা আসতে দেরি হলো না। জোলেখা কিছুমাত্র দুঃখিত না হয়ে নিজের দোষ খণ্ডানোর জন্য উদ্‌যোগী হলেন। তিনি এক ভোজ সভার আয়োজন করে নগরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত রমণীদের নিমন্ত্রণ করলেন। নির্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে সোনার থালায় নানা ধরনের ভোজন সামগ্রী পরিবেশিত হলো। সেই সাথে প্রত্যেকের থালায় একটি করে 'তুরঞ্জ' ফলও সরবরাহ করা হলো এবং প্রত্যেককে দেওয়া হলো ফল কাটার জন্য 'কাতি খরসান'। যথাসময়ে ভোজসভায় জোলেখা ইউসুফকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সভায় ইউসুফ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে হাতের ফল কাটার জন্য বলা হলো। 'তুরঞ্জ' কাটতে গিয়ে প্রত্যেকেই হাত বা হাতের অংশ বিশেষ কাটলেন। মিশরের চারিদিকে জোলেখার দুর্নাম বাড়তেই থাকলো। অনন্যোপায় হয়ে জোলেখা আজিজকে জানালেন ইউসুফকে কয়েদখানায় বন্দি করা না হলে তাঁর এ অপবাদ ঘুচবে না। তাঁকে কারাগারে পাঠানো হলো। ইউসুফকে বন্দিশালায় পাঠিয়ে জোলেখার দিন বিরহে কাটতে থাকে।

ইউসুফ বন্দিশালায় থাকা অবস্থায় একদিন বাদশা আজিজের মৃত্যু হলো। পূর্বের 'নরপতি' এখন রাজা হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে বর্তমান 'নৃপতি'র দুইজন অনুচর বন্দি হয়ে ইউসুফের সঙ্গেই কারাবাস করতে লাগলেন। এমন অবস্থায় এক রাতে দুই অনুচর ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন দেখলো। একজন স্বপ্নে দেখলো তার মাথার উপরে থালায় খাবার এবং 'চিলে কাকে কাঢ়িয়া খায়ন্ত শির পরে'। আবার অন্য অনুচর স্বপ্নে দেখলো তার হাতে সোনার 'কটোরা' এবং সে রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে দুইজনেই ইউসুফের কাছে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অনুরোধ জানালেন তিনি মুক্ত হয়ে বাদশাকে যেনো ইউসুফের মুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি ইউসুফের কথা ভুলে গেলেন। এভাবে বন্দিশালায় ইউসুফের কয়েক বছর কেটে গেলো। এক রাতে রাজা একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন:

সপ্ত বৃষ হৃষ্ট পুষ্ট অতি সুবলিত।
আর সপ্ত বৃষ কৃশ তনু দুর্বলিত॥
খীনবল সপ্ত গরু বলবন্ত হৈআ।
এহি সপ্ত বৃষক খাইতে গেল ধাইয়া॥
জেহ্ন ব্যাঘ্রে ঝম্প দিআ তাহাক ধরিল।
অহি সপ্ত পুষ্ট তনু গরুক ভক্ষিল॥[৩৮]

মিশররাজ পাত্রমিত্রদের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দির ইউসুফের কথা মনে পড়লো। ইউসুফের কাছে রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলো। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ইউসুফ জানিয়ে দিলেন এরাজ্যে আগামী সাত বছর ভালো ফসল জন্মাবে এবং পরবর্তী সাত বছর পানির অভাবে রাজ্যে ভালো ফসল হবে না। স্বপ্নের এমন ব্যাখ্যা শুনে নৃপতি বুঝতে পারলেন ইউসুফ মহাজ্ঞানী। ইউসুফের প্রজ্ঞা, জ্ঞান, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা দেখে নিঃসন্তান নৃপতি ইউসুফকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইউসুফ রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। ইউসুফ আজিজ মিছির নাম ধারণ করে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। রাজ্যময় ধন্যধন্য পড়ে গেলো। ইউসুফের শাসনে রাজ্যের সকল লোকের সুখের সীমা রইলো না। তিনি নিজে প্রতিটি গ্রাম ঘুরে দেখলেন। প্রতিটিগ্রামে দুটি করে শস্য ভাণ্ডার নির্মিত হলো। রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হলো। উপযুক্ত মূল্য দিয়ে শস্য কিনে প্রতিটি শস্য ভান্ডার পূর্ণ করা হলো। এভাবে সাত বছর চললো। ইতোমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হলো। ইউসুফ এখন মিশরের মহান অধিপতি।

অন্যদিকে জোলেখার অবস্থা তখন অত্যন্ত করুণ। দাসদাসী এখন আর তাঁর সেবা করে না। অর্থাভাবে তারা তাঁকে ছেড়ে গেলো। মাতৃতুল্য ধাত্রীও ইহলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোক গমন করলেন। দুঃখে, শোকে জর্জরিত জোলেখা এখন সাধারণ একজন 'নগরুয়া নারী'। সবকিছু হারিয়ে জোলেখা এখন প্রায় পথের ভিক্ষারীতুল্য। চোখের জ্যোতি নেই বললেই চলে। তবুও জোলেখা এখনো ইউসুফের প্রেমে দিওয়ানা। তাই ইউসুফকে দেখার জন্য তিনি প্রায় পথের ধারেই বসে থাকেন কিন্তু তাঁর দেখা মেলে না। অনেক চেষ্টায় একদিন জোলেখার সে আশা পূরণ হলো। জোলেখা ইউসুফের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলেন। ইউসুফ জোলেখার পরিচয় পেয়ে বারবার তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। জোলেখা তাঁর জীবনের দুঃখের কাহিনি জানালেন। ইউসুফ স্মৃতি রোমন্থন করে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন এবং জোলেখাকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। জোলেখা ইউসুফের কাছে বর প্রার্থনা করলেন। ইউসুফ মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা কবুল হলো। দেখতে দেখতে জোলেখা 'বৃদ্ধ কায়া তেজি হইল নতুন জৌবন'। জোলেখা আবার পূর্বের মতো রূপযৌবন লাভ করলেন। চোখের জ্যোতি ফিরে পেলেন। জোলেখার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ইউসুফ তাঁকে বিয়ে করলেন। দৈব বাণীর মাধ্যমে ইউসুফকে তা জানিয়ে দেওয়া হলো।

এবারে বাদশার দেখা স্বপ্ন সত্যি হলো। প্রথম সাত বছরে ফসল ভালো হলেও পরবর্তী সাত বছর বৃষ্টির অভাবে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। এমন দুর্ভিক্ষের সময়ে পশ্চিমের শাম রাজ্যের কেনানে বসবাসরত ইয়াকুব নবী ও তাঁর দশপুত্রসহ পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লেন। ঘরে খাবার না থাকায় পিতার আদেশে দশভাই চললেন আজিজ মিছিরের রাজ্যে। সঙ্গে নিলেন ইউসুফকে বিক্রি করে প্রাপ্ত 'তামার ঢেপুয়া' কারণ ঐ ঢেপুয়া ব্যতীত বাদশাকে উপহার দেওয়ার মতো তাঁদের কাছে তেমন কোনো অর্থই ছিলো না। পরবর্তীতে দশভাই অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে মিশর রাজ্যে উপস্থিত হলেন। ইউসুফ তাঁদের চিনতে পারলেন। তাঁদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করলেন। উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য দিয়ে ইউসুফ তাঁদের পুনরায় আসতে বললেন। এবং এটাও জানিয়ে দিলেন পরবর্তীতে এলে যেনো তাঁরা ইয়াকুব নবীর ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।

ইবনে আমিনকে সঙ্গে করে ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা পরবর্তীতে মিশরে এলেন। ইউসুফের সঙ্গে ইবনে আমিনের সাক্ষাৎ হলো। ইউসুফ কৌশলে ইবনে আমিনকে তাঁর কাছে রেখে দিলেন। ইউসুফের ভাইয়েরা ইবনে আমিনকে মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ইউসুফ জানিয়ে দিলেন কেবল ইয়াকুব নবী এলেই তিনি ইবনে আমিনকে মুক্ত করবেন 'বৃদ্ধ নবী মুখ দেখি খেমিবম দোষ'। পরবর্তীতে মিশরের সীমান্তে গড়ের মধ্যে ইয়াকুব নবী দশ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। স্বয়ং মিশর রাজ তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে লোকলষ্করসহ উপস্থিত হলেন। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেলো। রাজ্যের সাধারণ লোকও খুশিতে আত্মহারা হলেন। ইউসুফ মিশর সীমান্তে গড়ের সামনে উপস্থিত পাত্রমিত্রদের রথ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে গড়ের ভেতরে প্রবেশের জন্য আদেশ দিলেন। সবাই হৃষ্টচিত্তে রাজার সঙ্গে চলতে লাগলেন। আর ইউসুফ:

মস্তকের পাগড়ি লইয়া নৃপ করে।
পিতৃ পদ ধূলি মুছি বোলে মৃদুস্বরে॥
তোহ্মার তনয় আহ্মি তুহ্মি মোর পিতা।
ইছুফ মোহোর নাম তত্ত্ব কহি কথা॥
নবীএ দেখিলা জদি ইছুফ বদন।
আনন্দে পূরিত তান হইলেক মন॥
দুই করে ধরি পুত্র তুলি লৈলা কোলে।
মস্তক চুম্বিয়া পুত্র মিষ্ট বাক্য বোলে॥[৩৯]

এক স্বর্গীয় পরিবেশে পিতাপুত্রের মিলন হলো। ইয়াকুব নবী, তাঁর দ্বাদশ পুত্র, পুত্রবধূ, দুই নাতিসহ পরিবার পরিজন নিয়ে আনন্দে বসবাস করতে লাগলেন। এবারে আজিজ মিছির রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করলেন। বড় ভাইকে রাজ্যের মুখ্যপাত্র করা হলো। অন্যান্য ভাইদের যথাপোযুক্ত পদ দেওয়া হলো 'বড় ভাই রাখিলেন্ত মুখ্যপাত্র রাজ।/আর ভাই সমর্পিলা জথ রাজ কাজ'। ইউসুফের সুশাসনে রাজ্যে কারও অভাব রইলো না:

রাজ্যের সকল লোক আনন্দ বিশাল।
ইছুফ সমান রাজ্যে নাহি মহীপাল॥
রাজ্য সুখ ভোগে রাজা ইন্দ্র সম জান।
ত্রিভুবনে রাজা নাহি ইছুফ সমান॥[৪০]

এভাবে সাত বছর কেটে গেলো এবং 'রাজ্যেত দুর্ভিক্ষ নাহি শুভ দশা ভেল'। দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মুক্ত হয়ে দেশ আবার শস্যশ্যামল রূপ ধারণ করলো। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হলে ইউসুফ দিগ্বিজয়ে বের হওয়ার সংকল্প করলেন। পিতার অনুমতি নিয়ে 'চৌদ্দ অক্ষৌহিণী সৈন্য'সহ ইউসুফ 'নিরঞ্জন' নাম স্মরণ করে দিগ্বিজয়ে বের হলেন। সৈন্যদের মধ্যে সাজসাজ রব পড়ে গেলো। রথরথী, অশ্ববাহিনী, পদাতিক সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্রসহ যুদ্ধের নানা উপকরণ নিয়ে এক বিশাল বাহিনী পৃথিবীকে কম্পিত করে চললো দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে। ইউসুফের সৈন্য যেদিকে অগ্রসর হলেন সেখানকার রাজা আজিজ মিছিরের বৈশ্যতা স্বীকার করলেন। কোনো রাজাই ইউসুফের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হলো না। এভাবে দিগ্বিজয় করতে করতে এক সময় তাঁর বিশাল বাহিনী 'সুবর্ণপুর' নামক স্থানে উপনীত হলেন। সেখানে অবস্থানকালে ইউসুফ একদিন 'মৃগয়া করিতে' বাহির হলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে রাজকন্যা বিধুপ্রভার সঙ্গে দেখা হলো। পরবর্তীতে বিধুপ্রভার আমন্ত্রণে আজিজ মিছির বিধুপ্রভার পিতার রাজ্য 'মধুপুরী'তে

গেলেন। বিধুপ্রভা নিজে গিয়ে তাঁর পিতা শাহাবাল রাজাকে ডেকে আনলেন। আজিজ মিছির ও রাজা শাহাবালের মধ্যে আলাপ হলো। বিধুপ্রভার স্বপ্ন দেখা রাজকুমার নবীর পুত্র ইবনে আমিন যে ইউসুফের আপন ভাই সে তথ্যটিও ইউসুফ রাজা শাহাবালকে জানিয়ে দিলেন। সবকিছু অবগত হওয়ার পরে রাজা শাহাবাল তাঁর মেয়েকে ইবনে আমিনের সঙ্গে বিয়ে দিতে সম্মত হলেন। স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইবনে আমিন ও বিধুপ্রভার বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। পুত্র সন্তান না থাকায় শাহাবাল রাজ ইবনে আমিনকে রাজ্যদান করলেন।

মধুপুরী হতে ইউসুফ মিশরে এলেন। ইউসুফ আজিজ মিছির বা মিশরের রাজা রূপে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তিনি পিতা ইয়াকুব নবী, ভ্রাতৃগণ, স্ত্রী জোলেখা, পুত্র ও পুত্র বধূসহ সপরিবারে মহানন্দে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। অন্যদিকে ভাই ইবনে আমিনও মধুপুরীতে রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করলেন। উত্তরোত্তর সুখ সমৃদ্ধিতে তাঁদের রাজ্য কানায় কানায় ভরে উঠলো। কাহিনির শেষে কবি আমাদের জানিয়েছেন তিনি দেশি ভাষায় যে কাহিনি আমাদের পরিবেশন করেছেন তা কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত। এ কাহিনি শুনলে পুণ্য হবে এবং যশকীর্তি লাভ হবে বলে কবির বিশ্বাস।

পোথার বৃত্তান্ত জেবা চিত্ত দিয়া শুনে।
আদি অন্ত শুনিলে সে ভাব হএ মনে॥
ইছুফ জলিখা কিচ্ছা কিতাব প্রমাণ।
দেশী ভাষে মোহাম্মদ সগীরিএ ভান॥
এক চিত্তে শুনে জে এ সব পরস্তাব।
পুণ্য বাড়ে দুক্ষ হরে জশ কীর্তি লাভ॥[৪১]

কাহিনিটি বেশ দীর্ঘ। তবে বর্ণনার গুণে পাঠকের কাছে তা একঘেঁয়েমির সৃষ্টি করে না। সাবলীল কাহিনিটি পড়তে গেলে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। কাব্যে একটিমাত্র উপকাহিনি সংযোজনেও কবি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। 'পিতা ইয়াকুবের সঙ্গে পুত্র ইউসুফের পুনর্মিলনের মাধ্যমে মূল আখ্যান শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু কবি ইবন আমীন-বিধুপ্রভার উপাখ্যান সংযুক্ত করে কাহিনীকে পল্লবিত করেছেন। ঘটনার বিবরণ কাব্যের প্রধান অংশ; তবে পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে, স্বগতোক্তি আছে, ভাবাত্মক গানও আছে।'[৪২] ইবনে আমিন ও বিধুপ্রভা সম্পর্কিত উপকাহিনিটি পবিত্র কুরআন, বাইবেল কিংবা জামীর কাব্যে নেই। এটি একান্তভাবে শাহ মুহম্মদ সগীরের নিজস্ব পরিকল্পনা। অথচ এই নিজস্ব পরিকল্পনা কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মূল ঘটনা বা কাহিনির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। এতে করে কাব্যটির কলেবর হয়তো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন হয় নি। বরং রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অভিযাত্রার প্রসঙ্গ এ অংশে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য:

> গল্পরসসৃষ্টি সগীরের কাব্যের প্রধান বিষয় হয়েছে তার বড় প্রমাণ হল, কাহিনী শেষে ইবিন আমিন ও বিধুপ্রভার প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত রূপকথাসুলভ একটি অতিরিক্ত উপাখ্যানের সংযোজন। এতে ভাবক-ভাবিনীর কোন তত্ত্বসূত্র নেই, এঁরা মূল আখ্যানের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত পার্শ্বচরিত্রও নয়। কেবল ঘটনাবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কবির স্বকপোলকল্পিত গল্পাংশ এতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।[৪৩]

চরিত্র সৃষ্টিতে শাহ মুহম্মদ সগীরের কৃতিত্ব খুব বেশি না থাকলেও একেবারে কম নয়। কাব্যের মূল চরিত্র দুটি: ইউসুফ ও জোলেখা। তাঁরাই এ কাব্যের নায়ক ও নায়িকা। চরিত্র দুটি 'বাইবেল'

ও 'কুরআন'-এ বর্ণিত এবং সেখানে এ চরিত্রদ্বয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে জোলেখা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবির নিজস্ব পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়। প্রেমের জন্য জোলেখার যে ত্যাগ তা এক কথায় অতুলনীয়। ইউসুফকে পাওয়ার জন্য তিনি কী না করেছেন? প্রথম দিকে জোলেখার প্রেমের সঙ্গে কাম মিশ্রিত ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে বিরহের আগুনে পুড়ে তাঁর কাম পবিত্র প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। জোলেখা তিনবার স্বপ্নে দেখে তাঁর দয়িতকে পাবার জন্য সসৈন্যে মিশর সীমান্তে এসে আজিজ মিছিরকে বিয়ে করেছেন। সে যুগে এমন দুঃসাহসিক কাজ প্রায় দুর্লভ। পরবর্তীতে তিনি যখন জানতে পেরেছেন মিশরের বাদশা আজিজ মিছির তাঁর স্বপ্নে দেখা পুরুষ নন। তখন তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু দৈব্য বাণীর কারণে তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। বিবাহিত জীবনে স্বামীসুখ ভোগ তাঁর কপালে লেখা ছিলো না। কাজেই বিবাহিত হলেও তিনি কুমারীর ন্যায় বিরহে জীবনযাপন করেছেন। পরবর্তীতে স্বপ্নের রাজপুরুষ ইউসুফকে বহুমূল্যে ক্রয় করেছেন। কিন্তু ইউসুফের কাছে বারবার প্রেম নিবেদন করে তিনি খালি হাতে ফিরেছেন। ইউসুফকে পাবার জন্য রাজবধূ জোলেখার যেনো কৌশলের শেষ নেই। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা হিতাহিত জ্ঞানরহিত। জোলেখাকে কলঙ্কিনী বলা যেতে পারে কিন্তু তিনি 'কলুষিত' নন। ইউসুফের সর্বনাশা রূপই জোলেখাকে পতঙ্গের মতো তাঁর দিকে টেনেছে। শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে জোলেখা ইউসুফকে পেতে চেয়েছেন। ইউসুফের পাদতলে তিনি ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছেন, নিজ স্বামীকেও হত্যা করতে চেয়েছেন শুধু ইউসুফকে পাবার জন্য। 'সপ্ত টঙ্গী'তে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ নিতে জোলেখা ইউসুফকেই অপবাদ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। মিশর নগরে সর্বত্র তাঁর কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে তিনি নগরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের সামনে ইউসুফের রূপসৌন্দর্য তুলে ধরে তাঁর কলঙ্কের মাত্রাকে হালকা করতে চেয়েছেন। এত কিছুর পরও যখন ইউসুফ জোলেখার প্রেমফাঁদে বন্দি হয় নি তখন তিনি ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। ইউসুফকে কারাগারে পাঠিয়ে সেখানে যেনো ইউসুফের কোনো অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টিও তিনি নিশ্চিত করেছেন।

জোলেখার রূপোজ মোহ শেষ পর্যন্ত সত্যিকার প্রেমে পরিণত হয়েছে। তিনি জীবন-যৌবন, অর্থবিত্ত সব হারিয়ে পথের ধারে সামান্য ভিখারির মতো ইউসুফের প্রতীক্ষা করেছেন। দাসদাসী তাঁকে ছেড়ে গেছে, যৌবন তাঁর সঙ্গে হঠকারিতা করেছে, রাজশ্বৈর্য মরীচিকার ন্যায় দূরে গেছে কিন্তু তখনো ক্ষীণ আশা নিয়ে তিনি পথের ধারে এক নজর ইউসুফকে দেখার জন্য অপেক্ষা করেছেন। এ প্রেমই সত্যিকার প্রেম। তাই সমালোচকের মন্তব্য যথার্থই বলে মনে হয়:

> জোলেখা একটি বাস্তব চরিত্র। তিনি অকপটে ইউসুফের দেহমিলন কামনা করেছেন। আদর্শ-নীতির কথা তাঁর মনে স্থান পায়নি; ইউসুফ নীতির কথা বললে তিনি তা মোটেই মানতে পারেননি। হৃদয়ধর্মের কাছে নীতিকথা তুচ্ছ বলে মনে করেছেন। যা অনুভব করেন তাই সত্য, কাল্পনিক শাস্ত্রবাক্যে কি হবে? জোলেখার সমস্ত চৈতন্য ও আচরণ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, তিনি স্বমতে অবিচল, স্বপথে অনন্যগতি। তাঁর চরিত্রের মধ্যে ঠিক অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, কিন্তু অন্তর্দাহ আছে। তাঁর দগ্ধশেষ দেউলিয়া হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস শুনে আমরা ব্যথা অনুভব করি।[৪৪]

ইউসুফ চরিত্রটি সম্পূর্ণ আর্দশায়িত চরিত্র। তাঁকে অতিমানবীয় চরিত্র বলা যায়। ইউসুফের নীতিধর্মের কাছে শুধু জোলেখারই নয় এ পৃথিবীর কোনো নারীরই কোনো আবেদন নেই। জোলেখা যেখানে জীবনকে উপভোগ করার জন্য সবকিছু ছাড়তে প্রস্তুত সেখানে ইউসুফ নীতি

ও আদর্শ থেকে একচুলও নড়তে অপ্রস্তুত। তাঁর চরিত্রে মানবিকতার চেয়ে অতিমানবিকতাই লক্ষ করা যায়। তিনি মানবিক কামনা-বাসনা বর্জিত পাথরের মূর্তিবিশেষ। তাই জোলেখার প্রেম তাঁর হৃদয়ে সাড়া ফেলতে পারে না। তিনি জোলেখার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ধাত্রীর মাধ্যমে তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন:

হেন কি পাপিষ্ঠ আছে জগত মাঝার।
আপনা ইচ্ছায় বিষ খাএ মরিবার॥
মহাদেবী জেন গুরুপত্নীর সামন।
রাজপত্নী মাতৃতুল্য মোর অনুমান॥
আজিজে বুলিল মোক তুহ্মি পুত্র ধর্ম।
পুত্রধর্ম ন হএ করিতে হেন কর্ম॥
কেহো জদি শুনে এহি দুরাচার বাণী।
ভুবন ভরিয়া হৈব অজশ কাহিনী॥
ন কহ ন কহ ধাঞি মোত হেন কথা।
শুনিতে বিদরে হিয়া বড় লাগে ব্যথা॥[৪৫]

নারীর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ তাঁর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সপ্ত টঙ্গিতে জোলেখাই দোষী ছিলেন। কিন্তু ইউসুফ আজিজ মিছিরের কাছে এসত্য প্রকাশ করতে পারেন নি কারণ জোলেখার চরিত্র কলঙ্কিত হবে। বাল্যে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে কূপে ফেলে হত্যা করতে চেয়েছিলো কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি দুর্ভিক্ষের সময় শুধু তাঁদের জীবনই রক্ষা করলেন না অনুকূল পরিবেশে তিনি তাঁদের ক্ষমা করে রাজ কাজে নিয়োজিত করেছেন। রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে এতটা উদার হওয়া হয়তো সম্ভব নয়। কাজেই জোলেখা ও ইউসুফ প্রকৃত অর্থে দুই মেরুতে অবস্থানরত ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দুটি চরিত্র। 'ইউসুফের অতুল্য সততা, সংযম, প্রজ্ঞা, তিতিক্ষা ও ক্ষমা এবং রূপবহ্নির শিকার প্রবৃত্তিপরবশ জোলেখার প্রথমে সম্ভোগস্পৃহা ও পরে কৃচ্ছসাধনা এবং পরিণামে প্রেমিক নারীর কষিত কাঞ্চনের ঔজ্জ্বল্যে ও অকৃত্রিমতায় পদ্মের পবিত্রতায় এবং গোলাপের রূপে ও চম্পার গন্ধে উদ্ভাসন-এ কাব্যকে শাস্ত্রগ্রন্থের মাহিমা দান করেছে।'[৪৬]

গ্রন্থের অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে ইয়াকুব নবী, ইবনে আমিন, বিধুপ্রভা, মণিরু বণিক, আজিজ মিছির (জোলেখার প্রথম পক্ষের স্বামী), ইয়াকুব নবীর প্রথম পক্ষের দশ ছেলে, বিধুপ্রভা, শাহাবাল রাজা, ইউসুফকে রাজ্য দানকারী মিশরের রাজা, ইউসুফের দুই পুত্র ও পুত্রবধূ, ইউসুফের কারাসঙ্গী দুই বন্দি, জোলেখার ধাত্রী মাতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আবার স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল (আঃ), বনের বাঘ, তিন মাসের শিশু সন্তান, শুক পাখি মানুষের মতো কথা বলে তারা চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

ইয়াকুব নবী ন্যায়-নীতি পরায়ণ ধার্মিক পুরুষ। স্নেহবৎসল পিতা হিসেবে তিনি অনুকরণীয়। সৃষ্টিকর্তার প্রতি একান্তভাবে নিবেদিতপ্রাণ। ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভাইদের ইউসুফের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ আচরণ একান্ত স্বাভাবিক। সৎ ভাই, সৎ বোনকে অনেকেই মেনে নিতে পারে না। ইবনে আমিন নামটি বাইবেল ও কুরআন-এ থাকলেও মধুপুরী রাজ শাহাবালের কন্যা বিধুপ্রভার সঙ্গে প্রণয় ও বিবাহ সম্পর্কিত অংশটুকু নেই। বিধুপ্রভা, শাহাবাল রাজা, বিধুপ্রভার সখী লীলাবতী প্রভৃতি চরিত্র উপকাহিনি সংযোজনের প্রয়োজনেই সংযোজিত।

কাব্যের বেশকিছু স্থানে অলৌকিক বিষয় যেমন তিনমাসের শিশুর সাক্ষ্য দেওয়া, স্বপ্ন, দৈব বাণী, শুক পাখি সুধীর ললিত কিংবা বাঘের কথা বলার বিষয় রয়েছে। রোমান্সের বৈশিষ্ট্য হিসেবে যুগচাহিদা পূরণই এর লক্ষ্য। কাব্যে বেশ কয়েক স্থানে স্বপ্নের প্রসঙ্গ রয়েছে। ইউসুফ, জোলেখা, বণিক মণিরু, আজিজ মিছির, রাজবন্দিদ্বয়, ইবনে আমিন ও বিধুপ্রভা এরা সবাই স্বপ্ন দেখেছেন। এদের মধ্যে ইউসুফ ও জোলেখার স্বপ্ন এবং মিশররাজের স্বপ্ন দেখা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাকিদের ক্ষেত্রে অবশ্য সে কথা খাটে না। ইউসুফের স্বপ্নে এগারোটি নক্ষত্র-রবি-শশি তাঁকে সেজদা করতে দেখা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত বহন করে। ইউসুফের এ স্বপ্ন বৈমাত্রেয় ভাইদের ঈর্ষার প্রণোদনা জুগিয়েছে। জোলেখার স্বপ্ন জোলেখার জীবনকে চালিত করেছে। কাব্যের বেশ কয়েক স্থানে দৈব বাণীর প্রসঙ্গ রয়েছে। জোলেখা যখন জানতে পেরেছেন আজিজ মিছির তাঁর স্বপ্নের পুরুষ নন তখন তিনি মূর্ছা গেলেন এবং পরক্ষণেই তিনি দৈব বাণী শুনতে পেলেন। ইউসুফ কূপের মধ্যে, মিশরের কারাগারে বন্দিরত অবস্থায় এবং জোলেখাকে বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে দৈব বাণী শুনেছেন। বিধুপ্রভা দৈব বাণী শুনেই আত্মাহুতি দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। এসব অলৌকিক ঘটনা ও বিষয় রোমান্সসুলভ বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশক। সর্বোপরি সবকিছু ছাপিয়ে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে মানব প্রেম। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য যথার্থ মনে করি:

> সগীরের কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, এতে প্রেমের বিষয়টি মানবমনের চাহিদা অনুযায়ীই রূপায়িত হয়েছে। সেই চাহিদার বাইরে কল্পনাকে সেখানে বড়ো করে দেখানোর কোনো চেষ্টা নেই। সুতরাং সগীর তাঁর কাব্যে মানবীয় প্রেম-ভাবনার একজন খাঁটি রূপকার ছিলেন।[৪৭]

'জীবনের জন্যেই, জীবন নিয়েই সাহিত্য, তাই সাহিত্য জীবন থেকে উৎসারিত। এ কারণেই যে কালে জীবন যেমন, সাহিত্যে তেমনটি প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য হচ্ছে জীবন-বিম্বিত দর্পণ।'[৪৮] একাব্যে উল্লিখিত পাত্রপাত্রী, ঘটনা, স্থান সবকিছুই বিদেশীয় হলেও 'কাব্যটিতে কোন বিদেশী আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যের রক্তমাংস ও বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া কাব্যখানি পাঠ করিতে মনেই হয় না যে, ইহা কোন বিদেশীয় পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ।'[৪৯] কবি মরুভূমি মিশর, কেনান কিংবা শামদেশের প্রতিবেশ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কাব্যে উল্লিখিত রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সভ্যতা-ভব্যতা, সমাজ-সংস্কার, লোক-বিশ্বাস সবকিছুই বাঙালির। 'লক্ষণীয় এই যে, কবি মিশরদেশের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বাঙলাদেশের চিত্রই অঙ্কন করেছেন। রাজ্ঞী জোলেখা আর মিশর দেশ দু-ই কবির ধ্যানের চক্ষে বাঙলার বিরহিণী বধূ আর বাঙলাদেশ রূপেই প্রতিভাত হয়েছে।'[৫০] একাব্যের কাহিনি বাইরের কিন্তু তা পরিবেশিত হয়েছে একান্তভাবে বাংলাদেশের আবহাওয়ায়। একাব্যে ইউসুফ জোলেখা বা অন্য চরিত্রের আচার-আচরণ আমাদের দেশের পাত্র-পাত্রীদের মতোই। বৈষ্ণব পদাবলির রাধার মতোই জোলেখা বর্ষাকালে বিরহে কাতর হন, তিনি উর্বশী ও তিলোত্তমার মতো রূপবতী। বিধুপ্রভা বা জোলেখার সাজ-সজ্জা বাঙালি নারীর অনুরূপ। জোলেখার পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনায় কবি বলেন:

কনক রচিত মণি মাণিক্য নির্মাণ।
গীমগত হীরা হার নক্ষত্র প্রমাণ॥
শ্রবণে রতন মণি অধিক শোভন।

অঙ্গুরী বিচিত্র চিত্র সুরঙ্গ বসন॥
নাসা পাশে নথ মোতি কনক নির্মিত।
দোলনি চালনি জেহ্ন প্রবাল মণ্ডিত॥
করেত মণ্ডিত তার কাঁকন উঝর।
কনক বলয়া করে চন্দ্র দিবাকর॥[৫১]

জোলেখা মেহেদি দিয়ে হাত-পা রঞ্জিত করেছেন, সিথিতে দিয়েছেন সিঁদুর। মেহেদি ও সিঁদুর দেওয়া বাঙালি সংস্কৃতির অংশ। জোলেখার গলায় শোভা পায় 'গীম গত' হার, কানে দুল, হাতের আঙুলে অঙ্করী, নাকে প্রবাল নির্মিত নথ, কোমরে বাজুবন্ধ, কপালে তিলক, হাতে চুড়ি, পায়ে নূপুর ইত্যাদি। এগুলো বাঙালি নারীর সাজ-সজ্জার উপকরণ। আবার বিধুপ্রভার সাজ-সজ্জাও বাঙালি নারীর অনুরূপ। বিধুপ্রভা খোঁপায় মালতি ফুলের মালা পরেছে। বাংলার চিরন্তন নায়িকাদের মতোই জোলেখা অভিমানে কাতর ও বিরহে ব্যাকুল হয়েছেন; ষড়ঋতু উতলা করেছে তাঁর হৃদয়। কখনোবা কোকিলের ডাকে হয়েছেন উদাস।

বাঙালি অতিথিপরায়ণ জাতি। একাব্যে দেখা যায় ঘরে অতিথি এলে গৃহকর্তা অতিথিকে 'ভৃঙ্গারের জল' দিয়েছেন পা ধোওয়ার জন্য, অতিথিকে পাখা দিয়ে বাতাস করেছেন। পিতামাতা বা গুরুজনকে প্রণাম করা বাঙালি রেওয়াজ। এখানে ইউসুফ তাঁর পিতামাতাকে, জোলেখা তাঁর শ্বশুরকে, বিধুপ্রভা জোলেখাকে প্রণাম করেছেন। ইউসুফের ভাইয়েরাও ইউসুফকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়েছেন। বিধুপ্রভার স্বয়ম্বর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যা বাঙালি সমাজের রীতি। বিয়ে উপলক্ষ্যে বাদ্য বাজানো, নাচগান করা, সন্তান জন্মালে উৎসব পালন করা, খাওয়া শেষে দই-মিষ্টি-সন্দেশ পরিবেশন করা; কর্পূর সহযোগে তাম্বুল খাওয়া, চৌদোলায় করে বরযাত্রা বা শিবিকার ব্যবহার, জন্মান্তর, অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদে বিশ্বাস করা, উৎসব-আদিতে মঙ্গলগীত গাওয়া, আম, জাম, তুরঞ্জ (চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ ফল), নাগেশ্বর, লবঙ্গ, গুলাল, চম্পা, যূথী, চামেলি প্রভৃতি ফল-ফুলের উল্লেখ রয়েছে একাব্যে। এগুলো সবই বাঙালির।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের অন্যতম প্রধান বিষয় প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা। প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনাকে প্রকাশের জন্য কবি শাহ মুহম্মদ সগীর আশ্রয় নিয়েছেন ভাষা ও রচনারীতির। এভাষা ও রচনারীতি বহুমুখী ও বিচিত্রধারার। তাঁর কাব্যে প্রাকৃত ভাবাপন্ন ভাষার ব্যবহার বেশি দেখা যায়। প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা-কল্পনা ও অনুভূতি অভিব্যঞ্জিত হয়ে মাধুর্যমণ্ডিতরূপ লাভ করেছে আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে। কী ভাষায়, কী বক্তব্যে, কী বিষয়বস্তুর প্রকাশে কবি ছিলেন অত্যন্ত সচেষ্ট। ছন্দের ক্ষেত্রে পয়ার বা ত্রিপদীর অনুসরণ করলেও অলঙ্কারের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার কাব্যকে দান করেছে ভিন্নমাত্রা। মধ্যযুগের ধর্মীয় পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করে নয়, বরং তাকে স্বীকার করে নিয়েও কবি তাঁর কাব্যে যে মানবতার জয়গান গেয়েছেন তার মূলে কাজ করেছে তাঁর শিল্পচেতনা বা শিল্পবোধ। 'বাঙালি কবির জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, শিল্পবোধ, মনোজাগতিক চেতনাপ্রসূত সৃজন কল্পনা (creative imagination) একান্তই তাঁর নিজস্ব এবং নিজস্ব বলেই উল্লিখিত ধারার কাব্যে দেশীয়করণ ঘটেছে প্রায় সর্বত্র।'[৫২] মধ্যযুগের মানব-মানবীয় প্রণয়াকাঙ্ক্ষাজনিত সফলতা-ব্যর্থতার চিত্র অঙ্কন করতে বসে কবি মধ্যযুগীয় দৈবভাবনার ওপরে মানবিক মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং অনেকটা পেরেছেনও। কবি তাঁর কাব্যে লৌকিক ও অলৌকিক প্রেমচিত্র রূপায়ণ

করতে গিয়ে বিষয়োপযোগী ভাব-ভাষা, বক্তব্য এবং ছন্দ-অলঙ্কারের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কবি তাঁর কাব্যে ভাব-ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগের যে কারিশমাটিক প্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

তিন

ছন্দ

কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্যে অন্ত্যমিল বজায় রেখে নানা প্রকার পয়ার ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কবিকে 'পয়ার-ত্রিপদী মিলে প্রায় ত্রিশ হাজার জোড়-চরণের এই কাব্যে বৈচিত্র্য আনার জন্য অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে (Infra Structure) নানা ফর্মের সংযোজন করতে হয়েছে।'[৫৩] প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যধারাকে অনুসরণ করে কবি পয়ার ছন্দের ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, নাচাড়ি বা লাচাড়ি (দীর্ঘ ত্রিপদী), লঘু ত্রিপদী বা মধ্যছন্দ, খর্বছন্দ ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। 'লগ্নিকাছন্দ, জমকছন্দ, চন্দ্রাবলী, খর্বছন্দ, দীর্ঘছন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটি পরিবেশনার ঢঙ বা ভঙ্গি।'[৫৪] নিম্নে কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

মাত্রা

তে কারণে বাপের আ/দর বহুমান।	=৮+৬
ইছুফের তরে তান /পিরীতি সন্ধান॥	=৮+৬
সকল নয়ন ভরি /দেখি তান মুখ।	=৮+৬
সেই মুখচন্দ্র বিনু /আন নহি সুখ॥	=৮+৬
এয়াকুব নবীর ই/ছুফ জেহ্ন আঁখি।	=৮+৬
সর্বক্ষণ ইছুফ ন/য়ন থাকে পেখি॥	=৮+৬
আর দশ পুত্র তান /গৌরব সমান।	=৮+৬
তে কারণে তা সবার/ মনে দুক্ষমান॥[৫৫]	=৮+৬

ছন্দের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো দুএকটি স্থানে পর্বের মধ্যখণ্ডন প্রয়োজন হলেও প্রায় সর্বক্ষেত্রে পর্বের মাত্রাসমতা রক্ষিত হয়েছে।

অলঙ্কার:

কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্যে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার এই উভয় প্রকার অলঙ্কারই প্রয়োগ করেছেন সফলভাবে। শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, ধ্বন্যুক্তি, বক্রোক্তি এবং অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, নিদর্শন, ব্যতিরেক, বিরোধাভাস, সন্দেহ, অপহ্নুতি, ভ্রান্তিমান, দীপন, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। আমরা কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি:

অনুপ্রাস:

১. বাঘে ছাগে পানি খায় নিভয় নিডর।[৫৬]
২. পুলকে পূরল তনু অধিক উল্লাস॥[৫৭]
৩. চাচর চিকুর কেশ চামর নব ঘন।[৫৮]
৪. বাঁশী কাঁসী চৌরাশী বাজন অনিবার॥[৫৯]

যমক:

১. আক্ষি সভানের এক দাস দুরাচার।
কোপ করি ফেলিয়াছি কূপের মাঝার॥[৬০]

[ইউসুফের দশ ভাই ইউসুফকে বনে বিহার করার কথা বলে পিতা ইয়াকুব নবীর কাছ থেকে নিয়ে যায়। বনের মধ্যে গিয়ে ইউসুফের ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে ইউসুফকে হাত-পা বেঁধে কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় ইউসুফ অক্ষত অবস্থায় থাকে। ঘটনাক্রমে মণিরু নামের এক বণিক ইউসুফকে উদ্ধার করেন। ইউসুফের অপরূপ রূপ দেখে তিনি বিস্মিত হন এবং ইউসুফ হতে তাঁর ধনপ্রাপ্তি ঘটবে এমনটা আশা করেন। ইতোমধ্যে ইউসুফের দশ ভাই মণিরুর কাছে এসে জানায় তাঁরা তাদের এক অবাধ্য দাসকে রাগ করে কূপের মধ্যে ফেলেছে। মণিরু বণিক দাসকে পেয়েছে কিনা তা তারা জানতে চায়। এখানে 'কোপ' অর্থ রাগ এবং 'কূপ' অর্থ কুয়া। কাজেই যমক অলঙ্কার হয়েছে।]

২. নয়ান চঞ্চল তোক্ষা চকিত চকোর।
হেরিতে হরএ জ্ঞানবন্ত মতি ভোর॥[৬১]

৩. পত্রকারী দিল তবে সৈন্য সব আগে।
পত্র পাই পাত্র ভাগে পড়িবার লাগে॥[৬২]

শ্লেষ:

১. জদি রাত্রি বিরাম উদয় ভেল ভানু।
তার তাপে তাপিত কম্পিত সর্ব তনু॥[৬৩]

[জোলেখা পরপর তিনবার স্বপ্নে আজিজ মিছিরকে দেখে তাঁর প্রতি দেওয়ানা হলেন। মনে প্রাণে তিনি তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বাঞ্ছিতজনকে কাছে না পেয়ে তাঁর রজনী বিনিদ্রায় কাটে। আবার রজনীর শেষে আকাশে সূর্য উদিত হলে সেই ভানুর তেজ শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি করে। এজন্য বাক্যে 'তার তাপে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার রাত্রিতে আজিজ মিছিরের কথা চিন্তা করে জোলেখার সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হয় এবং তিনি শরীরে কম্পন বা শিহরণ অনুভব করেন। এজন্য 'তার তাপে' অর্থাৎ আজিজ মিছিরের কারণে বোঝানো হয়েছে। বাক্যে একটি শব্দ একবার প্রয়োগ করে দ্ব্যর্থকতা বোঝানো হয়েছে তাই এটি শ্লেষ অলঙ্কার হয়েছে।]

২. ক্ষুধা তিষ্ণা নিদ্রা নাহি বর্জিত বসন।
পরস্পর ভেদ নাহি ভাব অনুক্ষণ॥[৬৪]

[জোলেখা স্বপ্নে আজিজ মিছিরকে দেখে তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্ম, খাওয়া-দাওয়া, নিদ্রা ইত্যাদিতে তাঁর মনোযোগ নেই এমনকি প্রতিদিনের মতো বেশবিন্যাস বা সাজ-সজ্জার দিকেও তাঁর আগ্রহ নেই। রাত্রিদিন, ভালোমন্দ কিছুতেই তাঁর পার্থক্য নেই শুধু ভাবনাতে তিনি মশগুল থাকেন। এ জন্য 'ভাব অনুক্ষণ' বলা হয়েছে। আবার অন্য অর্থে জোলেখা সবকিছু ভুলে তাঁর দয়িতের ভালোবাসায় মগ্ন থাকেন এ জন্য 'ভাব' শব্দটিকে গ্রহণ করা যায়। কাজেই এখানে 'ভাব' শব্দটি ব্যবহার করে দুইটি অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।]

বক্রোক্তি:

মনে মনে অভিমান ভাবে আন আশা।
ধন দিয়া কিনিলুঁ আপনা দৈব দশা॥

[জোলেখা তাঁর পিতৃদত্ত ধন দিয়ে ইউসুফকে কিনে নিয়েছেন। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর স্বপ্নে দেখা পুরুষকে কিনে দাস হিসেবে তাঁর কাছে রাখবেন। শুধু তাই নয় কৃতদাসকে তিনি যে আদেশ করবেন তা সে মানতে বাধ্য হবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যায় ইউসুফকে ক্রয় করার পরেও ইউসুফ জোলেখার আদেশ অমান্য করেছে তাঁর সঙ্গে পাপকাজে লিপ্ত হয় নি। কাজেই জোলেখার বর্তমান দশাকে তিনি নিজেই ব্যঙ্গ করে দৈব দশা বলেছেন।]

ধ্বন্যুক্তি:

১. এ ঝাম ঝাঝরি ধ্বনি বাজে ঝনকারে।[৬৫]
২. ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনকার।[৬৬]

উপমা:

১. পুরাণ কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা বাণী 'অমৃত' অশেষ।[৬৭]
২. কিবা চোখ সচকিত চঞ্চল চকোর।
কিবা মধ্যে মধুকর সুধারসে ভোর॥[৬৮]
৩. কুচযুগ মধুপূর্ণ কাঞ্চন কটোরা।[৬৯]

রূপক:

১. সেহ সে পরম বিধি জীবন সাগর।[৭০]
২. আঁখি জ্যোতি বিভূতি সলিল রূপ-সিন্ধু।[৭১]
৩. কামানলে মোর /দহএ অন্তর
ঔখদ না মানে আন।[৭২]

উৎপ্রেক্ষা:

১. পূর্ণিমার চান্দ জেহ্ন বদন সুন্দর।
মধুর মধুর বাণী কহন্ত সুস্বর॥[৭৩]
২. শুভখনে রাজসুতা হইলা প্রসব।
চন্দ্র জেহ্ন প্রকাশিত জগত বল্লভ॥[৭৪]
৩. দিনে দিনে বাড়ে কন্যা জেহ্ন শশী-কলা।
মেঘ জনি উঠে জেহ্ন তড়িৎ উঝলা॥[৭৫]

অতিশয়োক্তি:

১. আঁখি জ্যোতি বিভূতি সলিল রূপ-সিন্ধু।
তার মর্ম মধ্যেত মজিল শত ইন্দু॥[৭৬]
২. সুবর্ণ ডালেত দুই দাড়িম্ব রতন।
নীলমণি উদিত অন্তরগত ধন॥[৭৭]

ব্যতিরেক অলঙ্কার:

১. অর্ধচন্দ্র জিনিআ ললাট সুবলিত॥[৭৮]
২. জগৎ জিনিআ আঁখি বিশাল বিপুল॥[৭৯]

৩. রক্তবর্ণ অধর অমৃত ফল জিত।[৮০]

সমাসোক্তি:

ভুজজুগ বলিত আকাশ তরুলতা।
কনক মৃণাল বাহু মঙ্গল বণিতা॥[৮১]

দৃষ্টান্ত:

কেহো বোলে এহি নহে মনুষ্য মূরতি।
রতন ভাণ্ডার এহি ত্রিভুবন জুতি॥[৮২]

নিশ্চয়:

১. তিরি হৈয়া পুরুষসিংহের পরাক্রম।[৮৩]
২. শুনহ ইছুফ তুহ্মি রূপে বিদ্যাধর।
গগনের চন্দ্র নহে তোহ্মা সমসর॥[৮৪]

ভ্রান্তিমান:

১. মলয়া সমীর মোর শমন সামন।
এ চান্দ চন্দনে দেহ দহএ নিদান॥[৮৫]
২. পূর্ণিমার শশী তার ঘরে প্রবেশিল॥[৮৬]

দীপন:

মুঞি শুষ্ক শস্য তুহ্মি জলদ নিপুণ।
বুন্দেক পড়িলে জল ন হৈবেক ঊন॥[৮৭]

বিরোধাভাস:

১. চৈতন্য পাইয়া কন্যা জীবন সন্দেহে।[৮৮]
২. পক্ষী রব শুনিতে জে বিদরএ হিয়া।
অনুক্ষণ সন্তাপেত স্মরে পিয়া পিয়া॥[৮৯]
৩. কুসুম্ব সুগন্ধি আর মলয়া সমীর।
মোর অঙ্গ পরশে অনঙ্গ বাণ দৃঢ়॥[৯০]

বিভাবনা:

১. কুসুম সুগন্ধি জথ আগর চন্দন।
অতাপে তাপিত তনু দহএ মদন॥[৯১]
২. গ্রাসিলেক রাহু মোর রূপ চন্দ্র জুতি
তোহ্মা রশ্মি দৃষ্টি হৈলে মোহোর মুকতি॥[৯২]

বিশেষোক্তি:

১. কন্যা মন চঞ্চল ইছুফ দরশনে।
দেখিতে উত্তম ফল ন পাই ভক্ষণে॥[৯৩]
২. দেখিতে আছম দিষ্টে ন পূরএ আশ।
মোর সনে বামাচারে ন জানি কি ভাস॥[৯৪]

বিষম:

১. বহুল আনন্দ ভাগ্য সম্পদ মিলিল।
সুধা মধ্যে বিষ আছে তাক না জানিল॥[৯৫]
২. মোর ভাব আনল না লাগে তান গায়।
মোর কর্মদোষে তান মনে নহি ভাএ॥[৯৬]

অসঙ্গতি:

১. হৃদয় অন্তরে ব্যথা সঘন সঞ্চার।
কাম বাণে দহএ নয়নে বহে ধার॥[৯৭]

২. মেঘের হুঙ্কার নাদ মোর প্রতি বরি।
পিউ বিনে জিউ মোর ধরাইতে ন পারি॥[৯৮]

ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের অলঙ্কার বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় কবি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার উভয়প্রকার অলঙ্কারেরই ব্যবহার করেছেন। শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেছেন সর্বাধিক অপরদিকে যমক, শ্লেষ বা বক্রোক্তি অলঙ্কারের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। আবার অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে কবি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। এছাড়াও তিনি উপমা ও রূপকের ব্যবহারও করেছেন বেশি। তবে উপমা ও রূপকের চেয়ে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন প্রায় কয়েকগুণ বেশি। শুধু এ কাব্যেই নয় মধ্যযুগের প্রায় সবকাব্যেই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। উৎপ্রেক্ষা, উপমা ও রূপক ছাড়া অন্যান্য অর্থালঙ্কারের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

মধ্যযুগের প্রথাবদ্ধ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো রূপ বর্ণনা। কবি জোলেখার রূপ বর্ণনায় কৃতিত্বের দাবিদার। জোলেখার সিথি থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত তিনি এ অংশে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাগুণে জোলেখার ছবি পাঠকের মানসপটে জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় জোলেখার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি উপমার ব্যবহার করেছেন সর্বাধিক। তাঁর ব্যবহৃত বেশিরভাগ উপমান এদেশীয়। জোলেখার গায়ের কান্তিকে কলাবতী ও প্রভাতের সূর্যের সঙ্গে, মুখের সৌন্দর্যকে পদ্মফুলের সঙ্গে, মাথার চুলকে ঘনকালো মেঘের সঙ্গে, ললাটকে অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে, চোখকে হরিণের চোখের সঙ্গে, যুগল নয়নকে চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে, চোখের দৃষ্টিকে চঞ্চল চকোরের দৃষ্টির সঙ্গে, কানকে গৃধিনীর কানের সঙ্গে, নাককে তিল ফুলের সঙ্গে, অধরকে অমৃত ফলের সঙ্গে, কুচযুগকে সোনার কটোরার সঙ্গে, কোমরকে শিবের ডমরুর সঙ্গে, নিতম্বকে করিকুম্ভের সঙ্গে, উরুকে রামকদ্দলীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অপরূপ রূপবতী রাজকন্যার সৌন্দর্য তাই অতুলনীয়:

তনু কান্তি নির্মল কমল কলাবতী।
প্রভাতে উদয় জেহ্ন সুরুজ দীপতি॥
হিমকর জনি জ্যোতি বদন প্রকাশ।
আকাশ প্রদীপ কি প্রফুল্ল মণিহাস॥
বদন নির্মল জেহ্ন বিকচ কমল।
জেহ্ন পূর্ণ শশধর জ্যোতি নিরমল॥[৯৯]

বারমাসি:

বারমাসিকে অনেকেই 'বিরহসঙ্গীত' নামে অভিহিত করেছেন। বারমাসিতে নায়ক-নায়িকার প্রেমাস্পদ বিহনে বিরহী হৃদয়ের আর্তিই ফুটে উঠে। 'গানগুলিতে বিরহাতুর নারীর মানসিক অবস্থা কখনও প্রাকৃতিক কখনও সাংসারিক পটভূমিতে করুণ মধুররূপে বর্ণিত হয়। বারমাসী গানের পরিচয়

মনসামঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি অনেক প্রাচীন পুথিতেই পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ লোকঐতিহ্য থেকেই এগুলিগ্রন্থে স্থান পায়।[১০০] মধ্যযুগের কাব্যের সবচেয়ে সার্থক অংশ এটি। 'প্রাচীন লোক কবিদের রচনাদর্শ অবলম্বন করে ভারতীয় সংস্কৃত ও আওয়াধী হিন্দী কাব্যের কবিরা বারমাসী রচনার রীতি প্রবর্তন করেন।'[১০১] শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্যে বারমাসি বর্ণনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'নিঃসঙ্গ জোলেখার 'বারমাসী'তে বার মাসে প্রকৃতির ও জীবনের পটভূমিতে জোলেখার চিত্তদাহের চিত্র আছে।'[১০২] তাঁর বারমাসি শুরু হয়েছে মাঘ মাস দিয়ে এবং শেষ হয়েছে পৌষ মাসে। বিরহী ঋতু আষাঢ়ের বর্ণনা কবি অত্যন্ত চিত্রবহুল, প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন:

বিদ্যুৎ তরঙ্গছটা চৌদিকে অম্বর ঘটা
মোর মন ভয়ে চমকিত।
নানা পক্ষী করে রব মঙ্গল পঞ্চমী সব
সুললিত মধুর সঙ্গীত॥
শ্রাবণ আইল ঋত মেঘছত্র চতুর্ভিত
নির্ভরে বরিষে জলধার।
নির্মল শীতল জল সতত বিরহানল
বিশেষ দহএ দেহা মোর॥[১০৩]

বর্ষা ঋতুকে বিরহের ঋতু নামে অভিহিত করা হয়। বাংলার প্রকৃতিতে আষাঢ় ও শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। এ সময়ে ঝরঝর অবিরাম বৃষ্টির ধারায় নদীনালা, খালবিল, পুকুর, মাঠঘাট ভরে যায়। প্রকৃতি রূপ পায় সতেজতার। অনাদিকাল থেকে প্রকৃতির এই রূপ চলে আসছে। এ সময়ে কৃষকের তেমন কোনো কাজ থাকে না। কাজেই কৃষক দূরদেশে কাজের খোঁজে যান। অন্যদিকে কৃষক ছাড়া কৃষাণীর বিরহের দিন কাটতে থাকে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* থেকে শুরু করে *বৈষ্ণব পদাবলি* সাহিত্যে হয়ে বর্তমান সময়ের সাহিত্যে বর্ষা ঋতুর এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কাজেই এ সময়ে জোলেখার বিরহের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তাঁর কাব্যে যে দুঃখের চিত্রের বর্ণনা পাই তা পাঠকের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন,

> বাস্তবিকই কবি মোহাম্মদ সগীরকে বেদনার কবি বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ব্যথার চিত্র অঙ্কনে এই কবি যেন সিদ্ধহস্ত। বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনা কবির লেখনীতে এমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, এক একবার কাব্য পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। কবির সহানুভূতির বৃত্তি এতই প্রবল যে, তিনি অতি সহজেই নায়কনায়িকার ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার নিজের মধ্যে তাহাদের বেদনা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন। এই জন্যই তাঁহার বর্ণিত দুঃখের চিত্রগুলি এতই করুণ; এই জন্যই এইগুলি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে।[১০৪]

হেঁয়ালি:

'সরস বুদ্ধিগম্য উক্তি-যাতে প্রশ্ন থাকে, যার উত্তরদানে প্রশ্নের মধ্যে অন্তর্নিহিত রসনিষ্পত্তির মজাটুকু উদ্‌ঘাটিত হয়-তাকেই সরল ভাষায় ধাঁধা বলা চলে। হেঁয়ালীও তাই, তবে হেঁয়ালীতে ধোঁয়াটে ভাব আর একটু বেশি থাকে, এবং অভিব্যক্তিতে সহজ একটি আবরণ থাকে।'[১০৫] *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যের কিছু হেঁয়ালির দৃষ্টান্ত:

১. তুহ্মি সুধাকর আহ্মি তিষ্ণাএ বিকল।

আহ্মা অল্প দিলে তোহ্মা ন টুটিব জল॥
তুহ্মি মহা কল্পতরু ফলিত নির্মল।
আহ্মা এক ফল দিলে ন হৈব নিষ্ফল॥[১০৬]

২. বিধি মোর ভাল জানে দোষ গুণ ভার।
আপনে বুঝিলা তুহ্মি করহ বিচার॥[১০৭]

৩. খাক হোন্তে পাক করি দিলা প্রাণদান।[১০৮]

প্রবাদঃ

লোকজীবনের বিশিষ্ট সম্পদ প্রবাদ। নিরক্ষর মানুষের মুখে মুখেই প্রবাদের জন্ম । প্রবাদের মধ্যে কবিকল্পনার কোনো স্থান নেই। তাই প্রবাদ প্রবচনের ভেতর দিয়ে সমাজ জীবনের যে চিত্র ধরা পড়ে তার একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে:

> প্রবাদ সাধারণতঃ লোক-ব্যবহারের মধ্যে থেকে গড়ে উঠে, উপমা রূপকাদি অলঙ্কারের সাহায্যে মানুষ যখন ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেন, তার মধ্যে যদি সার্বজনীনতা কিছু থাকে-অর্থাৎ সকলের প্রতি যদি ঐ লোকোক্তি একই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে- তখন তার বহু ব্যবহার ঘটে এবং ক্রমে তা প্রবাদ বা প্রবচনে পরিণত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জনসাধারণই প্রবাদগুলির জনক।[১০৯]

প্রবাদ সাধারণত সরলতা, সংক্ষিপ্ততা, বাস্তবতা, রসিকতা, ব্যঞ্জনাময়তা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে। 'বিভিন্নমুখী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহু পরীক্ষিত উপদেশ ও নীতি প্রচার করাই ইহার লক্ষ্য-রূপক ও বক্রোক্তি প্রধানতঃ ইহার অবলম্বন।'[১১০] *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যে ব্যবহৃত কিছু প্রবাদের দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করছি:

১. পুত্র শিষ্য হন্তে তিহঁ মাগে পরাজয়॥[১১১]

২. ক্ষুধা হৈলে বিভক্ষ্য ভক্ষে নি দুই করে।
তিষ্ঞাএ বহুল জল ন পিএ সত্বরে॥[১১২]

প্রবচনঃ

১. তুহ্মি মোর অন্ধকের লড়ি সবিশেষ।[১১৩]

২. নিগতির গতি মোর নাথ নিরঞ্জন।[১১৪]

৩. জৌবন গরবে কন্যা ন হইঅ বিকল।[১১৫]

মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম কাব্য রচনার গৌরব শাহ মুহম্মদ সগীর-এর প্রাপ্য। পনেরো শতকে কবি শাহ মুহম্মদ সগীর যে ধারার সৃষ্টি করেছিলেন তা মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত বহমান ছিলো। আন্তরিকভাবেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিলেন অনুরক্ত। তাই জীবনরসিক কবির কাব্যের কাহিনিও হয়েছে রসস্নিগ্ধ। সর্বোপরি বলা যায় *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যটি বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাই সমালোচকের মন্তব্য যথাযর্থ বলেই মনে হয়:

> 'প্রেমরসে ধর্মবাণী' রচনার সঙ্কল্প নিয়ে মোহাম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলেখা'র পরিকল্পনা করেন। বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে কাব্যের ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক, রীতি পর্যন্ত সব কিছুর দায়িত্ব তিনি নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম রূপকার হিসাবে এটি ছিল দুরূহ কাজ।[১১৬]

তথ্যসূচি:

---

[১] আবদুল হাফিজ, *বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৩

[২] Sally Wehmeier (edited), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth edition, Oxford University press, Great Clarendon Street, New York, 2000, p.1156.

[৩] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, ৮ম সং., খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১

[৪] বদিউর রহমান, *সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান* (সম্পাদিত), গতিধারা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৯৪

[৫] আবদুল হাফিজ, *বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়*, তদেব, পৃ. ৩

[৬] অমৃতলাল বালা, *পদ্মাবতী সমীক্ষা*, ৩য় সং., সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২০-২১

[৭] মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৭ সং., নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৫

[৮] আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফি সাহিত্য*, ২য় মুদ্রণ, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১

[৯] আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, ৩য় সং., অনন্যা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৩৩

[১০] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পু.মু., নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২১৬

[১১] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পু.মু., চারুলিপি, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১১১

[১২] আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, তদেব, পৃ. ১৩৪

[১৩] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পু.মু., নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৬৩

[১৪] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, তদেব, পৃ. ১১

[১৫] *ঐ*, *বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, ২য় সং., কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪

[১৬] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ২১৮

[১৭] মাহমুদা খানম, *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী কাব্যের প্রভাব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪৭।

[১৮] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, তদেব, পৃ. ১২২।

[১৯]. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৭১

[২০]. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, তদেব, পৃ. ৩৫

[২১]. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ২২০

[২২]. শাহেদ আলী, *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান*, বাতিঘর, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৭

[২৩]. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), পৃ. ১১৫

[২৪]. তদেব, পৃ. ২৩

[২৫]. তদেব, পৃ. ১১৫

[২৬]. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, ৪র্থ মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪৫

[২৭]. তদেব, পৃ. ৪৫

[২৮]. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), তদেব, পৃ. ২৩

[২৯]. ঐ, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, পৃ. ৪৬

[৩০]. ঐ, *ইউসুফ-জোলেখা*, পৃ. ৭১

[৩১]. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, তদেব, পৃ. ১৩৩।

[৩২]. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), তদেব, পৃ. ১১৭।

[৩৩]. তদেব, পৃ. ১৫৩

[৩৪]. তদেব, পৃ. ১৬২

[৩৫]. তদেব, পৃ. ১৯৫

[৩৬]. তদেব, পৃ. ২১১-২১২
[৩৭]. তদেব, পৃ. ২১৫
[৩৮]. তদেব, পৃ. ২৩৪
[৩৯]. তদেব, পৃ. ২৭৯
[৪০]. তদেব, পৃ. ২৮৬
[৪১]. তদেব, পৃ. ৩১০
[৪২]. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, তদেব, পৃ. ৩৫।
[৪৩]. তদেব, পৃ. ১৩১।
[৪৪]. তদেব, পৃ. ১৩২-১৩৩।
[৪৫]. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), পৃ. ১৮৯।
[৪৬]. তদেব, পৃ. ২৭
[৪৭]. আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, তদেব, ১৩৬
[৪৮]. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *২য় খণ্ড*, পৃ. ১৬৩
[৪৯]. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), পৃ. ৭২
[৫০]. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২২৮
[৫১]. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), পৃ. ১২০
[৫২]. লুৎফর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে নন্দনভাবনা: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩২
[৫৩]. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, পৃ. ৩৫
[৫৪]. লুৎফর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে নন্দনভাবনা: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, পৃ. ১৩৬
[৫৫]. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ-জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), পৃ. ১১৫
[৫৬]. তদেব, পৃ. ১১৫
[৫৭]. তদেব, পৃ. ১১৬
[৫৮]. তদেব, পৃ. ১১৮
[৫৯]. তদেব, পৃ. ২৪৭
[৬০]. তদেব, পৃ. ১৭২
[৬১]. তদেব, পৃ. ২০২
[৬২]. তদেব, পৃ. ৩০৪
[৬৩]. তদেব, পৃ. ১৩১
[৬৪]. তদেব, পৃ. ১৩১
[৬৫]. তদেব, পৃ. ১৫৪
[৬৬]. তদেব, পৃ. ২৪৭
[৬৭]. তদেব, পৃ. ১১৬
[৬৮]. তদেব, পৃ. ১১৮
[৬৯]. তদেব, পৃ. ১১৯
[৭০]. তদেব, পৃ. ১১৩
[৭১]. তদেব, পৃ. ১১৮
[৭২]. তদেব, পৃ. ১২৬
[৭৩]. তদেব, পৃ. ১১৫
[৭৪]. তদেব, পৃ. ১১৭
[৭৫]. তদেব, পৃ. ১১৭
[৭৬]. তদেব, পৃ. ১১৮
[৭৭]. তদেব, পৃ. ১১৯

[৭৮]. তদেব, পৃ. ১১৮
[৭৯]. তদেব, পৃ. ১১৮
[৮০]. তদেব, পৃ. ১১৯
[৮১]. তদেব, পৃ. ১২২
[৮২]. তদেব, পৃ. ১৭৩
[৮৩]. তদেব, পৃ. ১৮৪
[৮৪]. তদেব, পৃ. ২২০
[৮৫]. তদেব, পৃ. ১২৪
[৮৬]. তদেব, পৃ. ১৭১
[৮৭]. তদেব, পৃ. ২০১
[৮৮]. তদেব, পৃ. ১২৪
[৮৯]. তদেব, পৃ. ১৩০
[৯০]. তদেব, পৃ. ১৩১
[৯১]. তদেব, পৃ. ১২৪
[৯২]. তদেব, পৃ. ২৪৫
[৯৩]. তদেব, পৃ. ১৮৬
[৯৪]. তদেব, পৃ. ১৮৭
[৯৫]. তদেব, পৃ. ১৮২
[৯৬]. তদেব, পৃ. ২১৯
[৯৭]. তদেব, পৃ. ১৩৩
[৯৮]. তদেব, পৃ. ১৩১
[৯৯]. তদেব, পৃ. ১১৮
[১০০]. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ৩৭৬
[১০১]. মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি*, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১, পৃ. ২৭৪
[১০২]. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, পৃ. ৩৫
[১০৩]. শাহ মুহম্মদ সগীর, ইউসুফ-*জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), পৃ. ১৫৭
[১০৪]. তদেব, পৃ. ৩৩০
[১০৫]. বদিউর রহমান, *সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান*, পৃ. ১০৯
[১০৬]. শাহ মুহম্মদ সগীর, ইউসুফ-*জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), পৃ. ২০১
[১০৭]. তদেব, পৃ. ২১৩
[১০৮]. তদেব, পৃ. ২৮৮
[১০৯]. বদিউর রহমান, *সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান*, পৃ. ১৪২
[১১০]. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ২য় সং., ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৪৯৭
[১১১]. শাহ মুহম্মদ সগীর, ইউসুফ-*জোলেখা*, মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), পৃ. ১১৫
[১১২]. তদেব, পৃ. ২০২
[১১৩]. তদেব, পৃ. ১৪৬
[১১৪]. তদেব, পৃ. ১৫০
[১১৫]. তদেব, পৃ. ২০২
[১১৬]. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, পৃ. ৩৪